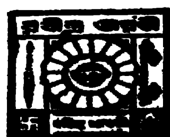
কথা ও সুর

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
মহর্ষি ভবন, ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭
মরকতকুঞ্জ, ৫৬এ বি. টি. রোড, কলকাতা-৫০

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৪৫

প্রচ্ছদ : শোভন সোম

প্রকাশক : কর্মসচিব, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
মহর্ষি ভবন, ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭
মরকতকুঞ্জ, ৫৬এ বি. টি. রোড, কলকাতা-৫০

মুদ্রক : শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

মণ্টু,

একত্রে অনেক গান বাজনা শুনেছি। মতের পার্থক্য বহুবার ঘটেছে। তবু যেন কোথায় একটা মিল ছিল, এখনও রয়েছে। আশা করি, এই বইটার পাতা ওল্‌টাবার পরও থাকবে।

ধুকু

উপাচার্য



রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬।৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৭

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'সংগীত' নিয়ে যাঁরা আলোচনায় তথা বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ইতিহাস অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর আধিপত্য সর্বজনস্বীকৃত। শিল্প সাহিত্য সংগীতের সমালোচনার আসরেও তিনি এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। 'সুর ও সংগীত' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের পত্রালাপের কথা বলা হলেও শুধু রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলিই মুদ্রিত হয়েছে, ধূর্জটিপ্রসাদের প্রশ্ন বা বক্তব্যের আভাস যাদের মধ্য থেকে মেলে। তার থেকেই বুঝতে পারি ১৯৩২ -এর আগস্ট থেকে ১৯৩৫-এর জুলাই অবধি কালপর্বে তাঁদের উভয়ের মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীত ও বাংলার গান নিয়ে আলোচনা চলেছিল। তারপর ১৯৩৮ সালে 'কথা ও সুর' প্রকাশিত হয়। 'উপক্রমণিকা' এবং 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' ছাড়া বইটিতে সংগীত সম্পর্কে পাঁচটি রচনা স্থান পেয়েছে যার অন্যতম হল 'কথা ও সুর'। ঐ নামেই বইটির নামকরণ।

ভারতীয় সংগীত, বাংলার গান ও রবীন্দ্র-সংগীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসুকে আজও এই বইটির তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য পরিতৃপ্ত করবে। অনুরূপ ভাবে 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' রচনাটির বিশেষ মূল্য রয়েছে। ১৯৩৬ সালে কবি তাঁর যৌবন-পর্বে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা'র নৃত্যনাট্যরূপ দান করেন এবং অভিনয় করান। একদা তাঁর পরমসুহৃৎ 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে 'চিত্রাঙ্গদা'র অনবদ্য ব্যাখ্যা রচনা করেছিলেন। আর ধূর্জটিপ্রসাদ 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র যে-রসাত্মক সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেন তার মূল্য অদ্যাবধি বিন্দুমাত্র কমেনি বরঞ্চ ক্রমশঃ বেড়েছে। সংস্কৃতি-অনুরাগী বাঙালী পাঠক-সাধারণের কথা মনে রেখে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ বইটি পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্য স্মরণ করি। আশা রাখি

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

সূচী

উপক্রমণিকা

সংগীতেও একটা ইতিহাসের দিক আছে। সেটা ভুলে গেলে চলবে না। কিন্তু দুঃখ এই যে আমরা ভুলতে বসেছি। আমার বিশ্বাস সংগীত সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতামত, মন কষাকষির প্রধান কারণ ঐ। আমি রবীন্দ্রসংগীতের দান বুঝতে চাই কালের প্রতিবেশে। সে-সম্বন্ধে সজ্ঞান হলে রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ মর্যাদা দিতে পারব, এবং কীর্তন ও আধুনিক রচনার বিচার করতেও সক্ষম হব। সেই সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির চলিষ্ণুতাও ধরা পড়বে।

বাঙালীর কান হিন্দুস্থানী, অর্থাৎ তথাকথিত অ-বাঙালী গায়ন পদ্ধতিতে অনেক দিন থেকেই অভ্যস্ত। আজ আবার নানা কারণে বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত। অনেকে বলবেন বিযুক্ত, কিন্তু বিরোধও একপ্রকার যোগ, অভিমান এবং দম্ভও একধরনের সম্বন্ধবোধ। আজকাল আবার কীর্তনের দাবি জোরগলায় জাহির হচ্ছে। যাঁরা অন্য প্রাদেশিক সংগীতের এক বর্ণও শোনেন নি তাঁরাও বলছেন বাংলার বিশেষত্ব তার কীর্তনে। কিন্তু মাত্র সে-হিসেবে কীর্তন ম্যালেরিয়া ও পানাপুকুরের সমগোত্রের। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই কীর্তনেও কি হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতির অন্তর্গত রাগরাগিণীর ছাপ নেই? অবশ্য সমাসটি বহুব্রীহি হয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু একদিনে, একজনের কৃপায়, একস্থানে হয় নি। লেগেছে বহুকাল, বহুজন, বহুস্থান, সমবেত কৃতিত্ব। তবেই কীর্তন হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। আধুনিক সংগীত সম্বন্ধেও এককথা। তাই উপক্রমণিকায় আমি পারিপার্শ্বিক দিতে চেষ্টা করলাম। বইয়ের মধ্যে ইতিহাসের মোটা ধারার বর্ণনা আছে, এখানে রইল আমার নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের, কারণ এই সময়ের মধ্যে কেবল যে ভারতবর্ষের সর্বত্র সংগীতের অবস্থান্তর ঘটেছে তা নয়, সে-বিষয়ে আমরা সজ্ঞান হয়েছি। একটা কথা বলে রাখি, উপক্রমণিকায় অনেক নাম আছে। কিন্তু পাঠকবর্গ সেজন্য আমাকে যেন দায়ী না করেন। তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের সংগীতে লেখাপড়ার বালাই নেই, তার বদলে আছে ঘরোয়ানা, অর্থাৎ

শিষ্যপারম্পর্য। যাঁরা গানবাজনা শুনেছেন তাঁদের কাছে হদ্দু খাঁ কিংবা মসীদ খাঁ কেবল নাম নয়, এক-একটি বৃহৎ রাগমালার স্বরলিপি, রাগরাগিণীর এক-একটি ভঙ্গিময় প্রতিমা।

সাধারণভাবে বোধ হয় বলা চলে যে করদ-রাজ্যে ধ্রুবপদ্ধতি এখনো চলছে, এবং ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশের ধ্রুবপদ্ধতির পাশে একটি নূতন গায়ন-পদ্ধতির সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বত্রই খানদানী কিংবা সত্যকারের পুরানো ঘরোয়ানা চাল লুপ্তপ্রায়। কিন্তু পরিবর্তন দুই প্রকারের। আজকাল অধিকাংশ রাজন্যবর্গের সংগীতপ্রীতি অন্যান্য আকর্ষণে শক্তিহীন। মাত্র অভ্যাসের খাতিরে ও মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁরা ওস্তাদ রাখেন। ব্যতিরেক অবশ্য আছে। পুরানো ঘরের গাইয়ে-বাজিয়ে করদরাজ্যে পাওয়া দুর্লভ, হয় তাঁরা নির্বংশ, নচেৎ তাঁরা শহরবাসী। সেনীয়া-বংশের গায়ক-গোষ্ঠীর কুলপতি গিধোড়ের বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ আলি খাঁ এবং বীনকার-গোষ্ঠীর প্রধান অধিনায়ক উজীর খাঁ আজ জীবিত নেই। সেনীয়ার একটি ঘর এখনো জয়পুরে আছেন, তাঁরা সেতারই বাজান। জাফরুদ্দীন, আলাবন্দে খাঁ এবং তাঁর পুত্র নসীরুদ্দীন এখন জনস্মৃতির মণি-কোঠায়। রবাবী আর একজনও নেই। সরোদের পীঠস্থান রোহিলখণ্ডে, বিশেষত রামপুরে। সেখানকার বিখ্যাত সরোদিয়া ফিদা হোসেনের এবং মহীশূরের বিখ্যাত বীনকার শেষান্না ও রামপুরের বীনকার উজীর খাঁর মৃত্যু প্রায় সমসাময়িক। পীঠাপুরম-এর সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কয়েক বৎসর পূর্বে নিজের বীণার পাশে দেহরক্ষা করেছেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালা-বাজিয়ে নাইডু ভিজিয়ানাগ্রামে থাকেন, তিনি অন্ধ হয়ে আসছেন, দেওয়াসের রাজাব আলির বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ইন্দোরের বিখ্যাত বীনকার মুরাদ আলি অল্পদিন হল মারা গেছেন, গোয়ালিয়রের অদ্বিতীয় ধ্রুপদিয়া ওমরাও খাঁ, টিকমগড়ের মৃদঙ্গী হরচরণ লাল অশীতিপর বৃদ্ধ। গোয়ালিয়রের রাজাভেইয়া, বরোদার ফৈয়াজ খাঁ, মৈহারের আলাউদ্দিন এখনো জীবিত— কিন্তু তাঁদের স্থান অধিকার করবার যোগ্য ব্যক্তি নেই। করদ-রাজ্যের মধ্যে বরোদা, গোয়ালিয়র, ভিজিয়ানাগ্রাম, মহীশূরের সংগীত-শিক্ষালয়গুলি গবর্নমেণ্টের কাছে অর্থসাহায্য পায়। সেগুলিতে ধ্রুবপদ্ধতির চলন আছে, যদিও শিক্ষাপদ্ধতি সনাতন নয়। আমাদের গায়কী যাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তাঁরা বলেন যে

সংগীত শিক্ষালয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়। বরোদা ও গোয়ালিয়রে ভাতখণ্ডেজীর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। গোয়ালিয়রে অন্য স্কুলও আছে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর মত এই যে তাঁর পদ্ধতির সাহায্যে পাঁচ বৎসর শিক্ষালাভ করবার পর আরো পাঁচ বৎসর শিক্ষার্থীকে কোনো বড়ো ওস্তাদের শাগির্দি করতে হবে, তবে গলায় গায়কী আসবে। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকারকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে যাই হোক্— খুব কম রাজ্যেই সংগীত শিক্ষালয় আছে। দুদিন পরে বলা চলবে না করদরাজ্যেই ধ্রুবপদ্ধতির পরিচয় মেলে। অন্যান্য বিখ্যাত ওস্তাদ আজকাল ইংরেজের শহরেই বাস করতে চান— সেখানে টাকা বেশি, শ্রোতা বেশি, কদর বেশি। ইদানীং আবদুল করিম খাঁ বরোদা ছেড়ে শহরে শহরেই ঘুরতেন।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশে গত পঁচিশ বৎসরের সংগীতের পরিবর্তন ভিন্ন প্রকৃতির। তার মূলে অনাদর নেই, আছে ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্য। যদি প্রাচীন পদ্ধতি দু-জায়গায়ই নষ্ট হয়েছে কেউ বলেন তবু তার কারণ এক নয়। প্রদেশে ধর্মচ্যুতির কারণ সাধারণের মধ্যে সংগীতানুরাগের প্রসার। সংগীতে অনুরাগ দেশাত্মবোধের লক্ষণ। অনুরাগের প্রসার ঘটেছে প্রধানত রঙ্গমঞ্চ, গ্রামোফোন, রেডিয়ো, টকি এবং খবরের কাগজের জন্য। প্রসারের ফলে অনুরাগের বিষয়-বস্তুর রূপ বদলে যায়। এই রুচি পরিবর্তন কিংবা বিকারের (?) সঙ্গে সামাজিক অবস্থান্তরের নিগূঢ় সম্বন্ধ। করদ-রাজ্যের সাধারণ জীবন এখনো আংশিক ভাবে একান্ত। সম্বন্ধহীন জীবনের শক্তি নৈষ্ঠিক রক্ষণা-বেক্ষণেই পরিশিষ্ট। পারিপার্শ্বিক অনুকূলই হোক, আর প্রতিকূলই হোক, যদি সেটি পরিবর্তনশীল হয় তবেই মানসিক জীবন ও পরিশীলন চলিষ্ণু হবে। অন্যান্য প্রদেশের সামাজিক জীবন করদ-রাজ্যের সামাজিক জীবনের চেয়ে গতিশীল এবং উন্মুক্ত। করদ-রাজ্যের মধ্যে যেগুলির সঙ্গে সন্নিকটস্থ প্রদেশের আদান-প্রদান চলে সেইগুলিতেই বিদ্যালয়ের মতন বিপ্লব-সাধক অনুষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, সেইগুলিতেই প্রথাসংগত শিক্ষাপদ্ধতি অর্থাৎ গুরুপরম্পরায় মৌখিক-শিক্ষা বিনষ্ট হচ্ছে। গোয়ালিয়র-বরোদার শিক্ষালয়ে ছেলে ধরে না, অথচ ওমরাও খাঁ, নসীরুদ্দীন, হাফেজের শিষ্যের মধ্যে সংখ্যাধিক্যের বালাই নেই। ওস্তাদবৃন্দ শেখাতে চান না এইটাই তাঁদের আশ্রিত জীবনের লক্ষণ; তাঁদের

দাম্ভিকতা সর্বসাধারণের অর্থহীন সংগীতস্পৃহার বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ। প্রাদেশিক শহরের প্রত্যেক ওস্তাদেরই সংগীত-বিদ্যালয় আছে— প্রতি ওস্তাদের শিষ্যবৃন্দের সংখ্যা অগুনতি। শহরের ওস্তাদ আজ আর শিক্ষাদানে কৃপণ হতে পারেন না।

অবশ্যই সব প্রদেশেই সংগীতের প্রতি অনুরাগ এক শ্রেণীর নয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে ধ্রুবপদ্ধতির প্রতি অনুরাগ উত্তর-ভারতের অপেক্ষা তীব্রতর। বোম্বাই-এর নাটকী-সংগীতও খেয়াল-ঘেঁষা, বাংলাদেশের নাটক-সংগীত (সিনেমা-সংগীতও) সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। মাদ্রাজ, বোম্বাই-এর আসরে প্রকৃত শ্রোতার সংখ্যাও বোধহয় শতকরা এ অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। মাদ্রাজে বোধহয় সবচেয়ে বেশি। বাঙালী মহিলারা আজকাল অনেকেই গানবাজনা করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে দুচারজন ছাড়া আর সকলেই নতুন ধরনের বাংলা গান গা'ন ও এস্‌রাজ বাজান। মাদ্রাজে অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়িতে মহিলাদের মধ্যে এখনো বীণার প্রচলন রয়েছে। মাদ্রাজ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বীনকার একজন মহিলা— বীণা ধনম্মল, তাঁর বয়স প্রায় একশো বৎসর, দক্ষিণী সংগীতে কূটতর্কের মীমাংসা এই মহিলাই করে দেন শুনেছি। তাঞ্জোর অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে একাধিক সংগীতে অশিক্ষিত ব্যক্তিও অতি সহজে দ্রুত তানের স্বরবিন্যাস বুঝতে পারেন আমি নিজে দেখেছি। তা ছাড়া, মাদ্রাজ ও আন্নামল্লী বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম সংগীতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও উপযুক্ত সংগীত-পুস্তক প্রকাশিত হয়। মাদ্রাজী সংগীতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রুতি সম্বন্ধে যে-প্রকার কূটতর্ক শুনেছি ও পড়েছি তাতে আমি মুহ্যমান হয়েছি। একমাত্র ভাটপাড়া ও নবদ্বীপেই তা সম্ভব। কিন্তু এই কূটতর্কই মাদ্রাজের রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। তার মানে নয় যে মাদ্রাজ অঞ্চলের সংগীতে কোনো বিচ্যুতি ঘটে নি। ত্যাগরাজ গত শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। সংস্কৃতের বহুল প্রচার এবং বিন্ধ্যাচলের ওপারে অবস্থিত বলেই বোধহয় মাদ্রাজের এই পরিবর্তন-বিমুখতা। মাদ্রাজী সংগীতই একমাত্র হিন্দুসংগীত— তাতে মুসলমানের ছোঁয়াচ লাগে নি— এই বলে অনেক মাদ্রাজী পণ্ডিত গৌরব অনুভব করেন। উত্তর-ভারতীয়েরা করেন না। মারহাট্টা দেশে মুসলমানী চালের প্রভাব এসেছে মাত্র ষাট-সত্তর বৎসর।

ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় খেয়ালী আলাদিয়া বোম্বাইয়ে থাকেন ; আবুল করিমের বাড়ি মিরাজে। আবুল করিম উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে সমান অভিজ্ঞ ছিলেন। মারহাট্টা গায়কেরা দুই পদ্ধতির কাছেই ঋণী। মারহাঠ্‌ঠাদের মধ্যে ধ্রুবপদ্ধতির আদর থাকলেও তাঁরা পরিবর্তনের বিপক্ষে নন।

পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বেহার ও বাংলার সাংগীতিক ধারা মোটামুটি এক হলেও প্রাদেশিক রুচিবিভিন্নতার জন্য তার রূপ ভিন্ন। পঞ্জাবে ধ্রুপদ, টপ্পা ও ভজনের, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খেয়াল বিশেষত ঠুংরীর, বেহারের বেথিয়া, ভাগলপুর ও গয়া অঞ্চলে খেয়াল-টপ্পার, এবং বাংলাদেশে ধ্রুপদ-টপ্পার প্রচলনই বেশি ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও বাংলাদেশের গাইয়ে-বাজিয়ে মিষ্টতার জন্য রাগিণীর শুদ্ধতা বর্জন করতে কখনো পরাঙ্মুখ হন নি। অতএব বলা চলে যে উত্তর-ভারতের সংগীতের ইতিহাস পরিবর্তনের স্বপক্ষে। যে প্রদেশে যে চালের কদর বেশি, সেই প্রদেশে সেই চালের আনুষঙ্গিক বাজনারও চলতি। এইজন্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সারেঙ্গী ও তবলা ও বাংলাদেশে পাখোয়াজ জনসাধারণের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাংলার পাখোয়াজ এখনো ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। বাংলায় এস্‌রাজের চলন হয় গয়া-নিবাসী কানাই ঢেঁড়ির কৃপায়। বাঙালী সরোদ ও বীণ গ্রহণ করে নি, তার বদলে সেতারকেই বরণ করেছে। গোবরডাঙার গিরিজাবাবুই বোধহয় বাংলার একমাত্র বড়ো সুরবাহারী। পূর্ববঙ্গে তবলার যথেষ্ট উন্নতি হয়।

বাংলাদেশে এই যুগের ঠিক পূর্বেকার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল না। রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের কৃপায় কলকাতা শহরে অনেক সুধীজনের সমাগম হত এবং সংগীত সম্বন্ধে একাধিক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। দেশস্থ জমিদারবর্গও সংগীতে উৎসাহী ছিলেন। তখন এই শহরের নানা পল্লীতে সংগীত-সমাজ ছিল ; যেটি প্রধানতম সেটি ছিল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। সেখানে নাটোরের মহারাজা, আশু চৌধুরী, মন্মথ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ সকলেই সভ্য ছিলেন। ময়মনসিংহের জমিদাররাও কলকাতায় ওস্তাদ নিয়ে আসতেন। এর পরে সংগীতসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যদুভট্ট ও রাধিকাপ্রসাদ থাকতেন। অঘোরবাবু উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী, এবং বিশ্বনাথ রাও ভালো ধামারী ছিলেন, লালচাঁদ বড়াল তাঁর শিষ্য। কেশব মিত্র, মুরারি

গুপ্ত, ভূপতিবাবু, অবনীবাবুর শিষ্যের মধ্যে অনেকেই উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গী ও তবলিয়া হন। অঘোরবাবু, অনন্তনারায়ণ ও গোপেশ্বরবাবুর গোষ্ঠীর অনেকেই তখন কলকাতার বাইরে থাকতেন, কিন্তু প্রায়ই কলকাতায় আসতেন। ভারতের সব বড়ো ওস্তাদই কলকাতায় এই সময়ে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কব্বুব খাঁ ও তাঁর ভাই কেরামৎউল্লা কলকাতাবাসী হন। এমদাদ্ খাঁ তারাপ্রসন্নবাবুর বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তাঁর পুত্র, এখনকার ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সেতারী এনায়েৎ খাঁ, তখন যুবক ছিলেন। কলকাতার তখনকারের বিখ্যাত খেয়ালিয়ার মধ্যে গোপালবাবু, (নুলো গোপাল) ও লছমীপ্রসাদের নাম করা যেতে পারে। শুনেছি, 'নুলো গোপাল' ধ্রুপদও গাইতেন লছমীপ্রসাদ ভালো সেতার ও তবলা বাজাতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিবপ্রসাদ ও পশুপতি, কেরামৎউল্লার মতোই নেপালের চাকরি পরে ছেড়ে এই শহরে আসেন। বেহালার বামাচরণবাবু আলিবক্সের শিষ্য, তাঁর ধ্রুপদাঙ্গের খেয়াল লোকে শেখে নি। অঘোরবাবুও আলিবক্সের কাছে উচ্চাঙ্গের খেয়াল নেন। শরৎবাবু (অন্ধ) হিন্দীচালে বাংলা গান গাইতেন। বিখ্যাত টপ্পাবাজ রমজান ও ঠুংরী-গাইয়ে মৈজুদ্দিন তখন কলকাতার অধিবাসী। সোরীর টপ্পার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় হয় রমজানেরই কণ্ঠে। বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম সরোদিয়া হন রজনী রায়, লেখক রাজকৃষ্ণ রায়ের পুত্র। আরো পূর্বে বাঙালীদের মধ্যে ন্যাসতরঙ্গে কালীপ্রসন্ন ও সুরবাহার সেতারে জিতেনবাবুর পিতা বামাচরণবাবু, গিরিজাপ্রসন্নবাবু ও ভগবান দাস অদ্বিতীয় ছিলেন। অতএব এই যুগে বাংলাদেশে, কলকাতায় এবং গণ্ডগ্রামের জমিদারবাড়িতে উচ্চ-সংগীতের আদর ছিল যথেষ্ট, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাধারণের মধ্যে বিশেষ কোনো আদর ছিল না।

ত্রিশ বছর পূর্বে বাঙালী ঠুংরীর আদর করে নি। শ্যামলালবাবুর বাড়ি এবং দুলিচাঁদের বাগানে মৈজুদ্দিন গাইতেন এবং লচাও ঠুংরীর প্রবর্তক ভেইয়া সাহেব, গোয়ালিয়র মহারাজার ভাই গণপৎ রাও, তাঁর সঙ্গে এবং একলা হারমোনিয়মে ঠুংরী বাজাতেন। শ্যামলালবাবু এবং এঁদের কাছে ঠুংরী শিখেই গিরিজাবাবু আজ বাংলা কেন সমগ্র ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ঠুংরীগায়ক হয়েছেন। ১৯১০ সালের পূর্বে তিনি ছিলেন ধ্রুপদী, রাধিকাবাবুর প্রিয়

শিষ্য। রাধিকাবাবু তখন থাকতেন কাশিমবাজারে। এই সময়ে পাখোয়াজীর মধ্যে দুর্লভবাবু ও নগেনবাবুর সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা ছিল। বউবাজারের দীনবাবু, বৈকুণ্ঠবাবু ও উলুবেড়ের তারকবাবুরও পাখোয়াজ বাজনার সুখ্যাতি ছিল যথেষ্ট।

ঘরোয়ানা পদ্ধতির শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো প্রদেশে বিশেষত বাংলায় নবজীবনের সূত্রপাত হচ্ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে নবজীবনের সূচনা হয় রঙ্গমঞ্চে। সব প্রদেশেই নাটকী-সংগীতকে সংগীতজ্ঞেরা ঘৃণা করতেন। কিন্তু ইতিহাসে কিছুই ঘৃণ্য নয়। উচ্চ-সংগীতে অনভিজ্ঞ নব্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিন্তু রঙ্গমঞ্চের প্রতি নিতান্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কলকাতার রঙ্গমঞ্চের জন্য সুর বসাতেন দেবকণ্ঠবাবু। রঙ্গমঞ্চের জন্য বিলাতী আদর্শে কনসার্ট তৈরি হল, সেখানে বিখ্যাত ক্লারিওনেট বাজিয়ে হাবু দত্ত, ননী নিয়োগী, অমৃতবাবু ও চণ্ডীবাবুর গৎ বাজানো হত। দক্ষিণাবাবুর তারের কনসার্টে বিদেশী সুরপদ্ধতির আমেজ ছিল। যাত্রায় উচ্চ-সংগীত গাওয়া হত, কিন্তু যাত্রাও রঙ্গমঞ্চের টেকনিক দ্বারাই শীঘ্রই অপেরায় পরিণত হল, অর্থাৎ সেখানেও থিয়েটারি সংগীত প্রবেশ করলে। এই প্লাবন থেকে ওস্তাদবৃন্দ আত্মরক্ষা করলেন অভিমানের আচ্ছাদনে। কিন্তু বাংলায় পলিমাটি পড়ল। তার কারণও ছিল যথেষ্ট।

বাংলাদেশে বাংলাভাষায় সংগীতরচনা অনেকদিন থেকেই চলছিল। যাত্রাগানে, ঢপ, পাঁচালী, তরজা ও কবির লড়াইয়ে বাংলা গান গাওয়া হত। তার ওপর ছিল কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল, জারি প্রভৃতি দেশীসংগীত। তাকে প্রাচীন ভাষায় অর্থসংগীত বলা চলে। এক কথায়, বাংলা গানের প্রাণ ছিল সাহিত্যের অর্থাৎ ভাবের, তার তান ছিল কথার অর্থাৎ আখরের। তার ওপর রামপ্রসাদ, নিধুবাবু প্রভৃতি জনকয়েক রচয়িতার রচনা আধ্যাত্মিক ও রসের গুণে নিজের স্থান অধিকার করে নেয়। আমাদের বাল্যকালে কয়েকজন উচ্চশ্রেণী রচয়িতার গানের প্রচার হয়। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির ও স্বদেশী গান, রজনীকান্তের আধ্যাত্মিক গানগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের নানা প্রকারের গান বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। এঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সুরকে ভেঙে একাধিক কণ্ঠের উপযোগী করেন এবং দেশী ও হিন্দুস্থানী রাগিণী ওলট-পালট করে হাসির গানের উপযুক্ত আকস্মিকতা আনেন। রবীন্দ্রনাথ

অনেক দিন পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলেন, যদিও তাঁর পূর্বেকার রচনায় বিদেশী হালকা স্থরেরও সাক্ষাৎ মেলে।

কিন্তু আমাদের যুবা বয়সেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সংগীত-রচনার ইতিহাসে কালান্তর ঘটে। গীতাঞ্জলির একাধিক কবিতা এই সময় লেখা হয়। তিনি আর অনুকরণে কিংবা বাহ্যিক সংস্কারে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, নিজের পথ কেটে চললেন। এইজন্য পুরাতনীরা রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের রচিত গানের অত ভক্ত। কিন্তু স্থষ্টির বীজ পূর্বেই লুকানো ছিল— গত পঁচিশ বৎসরে যেটি মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কথা, ভাব ও স্থরের সংমিশ্রণে যে নূতন সংগীত-রূপের সন্ধান মেলে সে-রূপ অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর পরিণতির পরিচয়, কিন্তু পরিশীলনের দিক থেকে সে-রূপ বাংলা গানের ভবিষ্যতের স্থনিশ্চিত ইঙ্গিত। অন্য রূপ সংস্কৃতির বেগভার সহ্য ও ধারণ করতে পারে না। পূর্বোক্ত মন্তব্য ভালো লাগা-না-লাগার অতীত। হয়তো অন্য রচয়িতার কোনো কোনো গান রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানের চেয়ে শ্রুতিমধুর। কিন্তু ইতিহাসের তরফ থেকে তাঁর রচনার মূল্য এই যে স্থষ্টির দিকনির্ণয়ে তাতে কোনো ভুল নেই। সে রচনা স্থষ্টিতত্ত্বের মহিমায় সাকার।

সেদিন পর্যন্তও বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ কিন্তু এই স্থষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো সচেতন ঔৎস্থক্য প্রকাশ করে নি। বোধ হয় কোনো মধ্যবিত্ত সমাজই করে না। অথচ আগ্রহ ছিল এবং দিলীপকুমার কয়েক বৎসর পরে সেই আগ্রহকে মুখর করলেন। স্থকণ্ঠ ও সামাজিক গুণাবলীর সাহায্যে এবং বিশেষ করে স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো প্রকৃত শিল্পীর আদর্শ প্রভাবে তিনি হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে বাংলা গান গাওয়ার প্রচার করেন। কিন্তু তাঁর সত্যকারের কৃতিত্ব হল— মনের চাহিদাকে মুখর করা। তিনি ও তাঁর বন্ধুবর্গ রাগিণীর মূল রূপটি বজায় রেখে তানের পরীক্ষা করতেন এবং আদি রূপের উপর নানাবিধ অলংকার বসাতেন। হয়তো সব অলংকার স্থকুমার হত না। সে যাই হোক, তিনি প্রধানত বাংলা গানেরই প্রবর্তক। বাংলা গান গাওয়ার মধ্যে প্রাচীন প্রথার অন্তরে যে বিরোধী তত্ত্ব সর্বদাই নিহিত থাকে সেই বিরোধের আশীর্বাদেই সংগীতে তিনি প্রকৃত বিদ্রোহী। তাঁকে প্রথাসংগত ওস্তাদ কেউ বলবে না।

পূর্ব থেকেই অতুলপ্রসাদ সংগীত রচনা করতেন। গত পনেরো বৎসরের মধ্যে তাঁর গান নিতান্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর সুকুমার রচনায় আমরা ঠুংরী, গজল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালের সঙ্গে হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর সুন্দর সমন্বয় উপভোগ করি। তাঁর সহজ কথা ও অপেক্ষাকৃত লঘু সুর হৃদয়ের ভাবসম্পদে সুগভীর। তাঁর সংগীত-রচনা উচ্চশ্রেণীর। অতুলপ্রসাদের পর কাজি নজরুলের নাম করতে হয়। তাঁর একাধিক রচনা সত্যই মূল্যবান। অনেকেই আজ অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের ঢঙের সঙ্গে গজল বা অন্য কিছু চলতি সুর মেশাচ্ছেন। গ্রামোফোন, রেডিয়ো, টকিতে এই চালেরই প্রচলন। কিন্তু তার সাংগীতিক মূল্য কম। পরীক্ষা হিসেবে তাকে অবহেলা করা যায় না— পরীক্ষা চলেছে, থামছে না— এইটাই প্রাণের লক্ষণ। ভুল করবার স্বাধীনতাও স্বাধীনতা।

কিন্তু কেবল বাজারে-ঠুংরি গজলই বাংলাদেশে চলেছে বলা নিতান্তই ভুল। গত তিন-চার বৎসরে যুবক-যুবতীর মধ্যে সংগীত-রুচির অন্যপ্রকার পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করেছেন। বাঙালীর চালিত গ্রামফোন কোম্পানির রেকর্ডে ও রেডিয়োতে খেয়াল ধ্রুপদ শোনা যাচ্ছে। নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে— সংগীত আসরে ভীষণ ভিড় হচ্ছে এবং বাঙালী যুবক-যুবতী কষ্ট করে খেয়াল-ঠুংরী ও ধ্রুপদ, পাখোয়াজ এবং বাঁয়া-তবলা শিখছে। বাংলায় উচ্চ-সংগীত মরে নি, তার নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। কলকাতার আসরে একাধিক যুবক ভিন্ন শ্রেণীর মল্লারের পার্থক্য অনুভব করেন আমি প্রমাণ পেয়েছি। পঁচিশ বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ সমঝদারেরাই পারতেন। ধ্রুপদে বিষ্ণুপুরী ঢঙেই প্রায় সকলেই গাইছেন। হয়তো উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটেছে, কিন্তু বাঙালীর লয়ভঙ্গ হয় না। রাগিণীর শুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। বাংলার বাহিরে এক অমৃতসর জলন্দরের দু-একটি ঘরোয়ানা এবং পাতিয়ালার চাঁদ খাঁ ওসমান খাঁ ব্যতীত অন্য কোনো যুবক ধ্রুপদ গান ব'লে আমার জানা নেই। কলকাতা শহরে যুবকদের মধ্যে অন্তত চার-পাঁচজন ধ্রুপদিয়া আছেন যাঁদের গান হারমোনিয়মের বিকট আওয়াজে না চাপা পড়লে শ্রোতব্য হত। স্বীকার করতেই হবে আজও যে এদেশে ধ্রুপদ জীবিত রয়েছে সেজন্য গোপেশ্বরবাবু ও তাঁর আত্মীয়স্বজন, অঘোরবাবুর শিষ্য গোপালবাবু, রাধিকা-

বাবুর ও মহিমবাবুর শিষ্য ভূতনাথবাবু ও পুত্র ললিতবাবু, বিশ্বনাথ রাওয়ের শিষ্য দানিবাবু ও অমরবাবুর কাছে বাঙালী কৃতজ্ঞ। গোপেশ্বরবাবুর পুস্তকগুলি উচ্চ-সংগীতের সম্পত্তি রক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে। বাঙালী অবশ্য খেয়াল নতুন শিখছে। খেয়ালে মুসলমান-গায়কীর চলনই বেশি হচ্ছে। কারণ বোধহয় এই যে বাংলায় মুলো গোপাল ও যদু ভট্ট ব্যতীত অন্য কোনো বড়ো বাঙালী খেয়ালিয়া ছিলেন না। যদুভট্টের কোনো খেয়ালি শিষ্য ছিল কিনা জানি না। মুলো গোপালের শিষ্য সাতকড়িবাবু। অঘোরবাবু ইদানীং কাশীতে থাকতেন। তাঁর খেয়ালের শিষ্য কেউ আছেন কিনা জানি না। সুরেন মজুমদার মহাশয় দেবীসিং-এর কাছে বেহারাঞ্চলে গান শেখেন। বামাচরণবাবু ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারের অদ্বিতীয় খেয়ালিয়া আলিবক্সের শিষ্য। তাঁর ঘর বাঙালীর নয়। আমাদের যুবা বয়সের পূর্বে বাঙালীর মুখে সদারঙ্গী খেয়াল শোনবার সৌভাগ্য জনসাধারণের ঘটে নি। পানিহাটির ভট্টাচার্য গোষ্ঠী, চন্দননগরের মহেশবাবু, শ্রীরামপুরের মধুবাবু ভালো খেয়ালিয়া ছিলেন শুনেছি— কিন্তু তাঁদের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল জানি না। কিন্তু আজ যে এই শহরে রুচি পরিবর্তন হয়েছে তার জন্য দায়ী খলিফা বাদল খাঁ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ। গিরিজাবাবু অবশ্য আরো অনেক বড়ো ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ খেয়াল শিখেছেন। বাদল খাঁর অন্য শিষ্যের মধ্যে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও শচীন দাস যে-কোনো আসর জমাতে পারেন। আনন্দের কথা এই যে আজকাল প্রায় সব সংগীত-শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। বাংলার বাইরে যে-সব যুবক গান শিখেছেন তাঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রলাল, প্রশান্ত, অম্বিকা, পাহাড়ী ও স্মরজিতের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার অন্য শ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়া হলেন জ্ঞানেন্দ্র গোঁসাই, রাধিকাবাবুর ভাইপো। তাঁর গলা শ্রুতিশুদ্ধ এবং গায়কীও ভালো, গমকপ্রধান। আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে জ্ঞানেন্দ্র গোঁসাই ও ভীষ্মদেব ভিন্ন দিক থেকে ভারতের জীবিত শ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়াদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে তাঁদের বিশেষ কৃতিত্বের জন্য আংশিকভাবে দায়ী বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাস।

বাঙালী যুবকদের মধ্যে আজকাল অনেকে খুব ভালো তবলা বাজান।

হীরু গাঙ্গুলী ও রাইচাঁদ বড়াল আমাদের গৌরব। দুজনেই মুসলমান ওস্তাদের শিষ্য। যন্ত্রীর মধ্যে ধীরেন বসু ও তিমিরবরণ সুনাম অর্জন করেছেন সরোদ বাজিয়ে। যুবকদের মধ্যে রাধিকাপ্রসাদ চমৎকার বাজাচ্ছেন। এই প্রদেশে বাঙালীর মধ্যে উৎকৃষ্ট সেতারীর সংখ্যা বেশি নয়। সেতারী হরেন্দ্রনাথ শীল এবং জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে যুবক বলা যায় না। তাঁরাও আজ গত। কালীঘাট ও ভবানীপুর অঞ্চলে প্রমথবাবুর শিষ্যেরা খেয়াল গান, সে খেয়ালে যন্ত্রালাপের অংশই বেশি।

উচ্চসংগীত শোনবার জন্য সংগীত-বিদ্যালয় ভিন্ন আসর, স্মৃতিবাসর প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান উঠেছে। সংগীতবিষয়ে নানাবিধ পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে; একখানি মাসিক পত্রিকাও রয়েছে। পুস্তকের মধ্যে গোপেশ্বরবাবুর বইগুলি, দিলীপকুমারের ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা এবং রবীন্দ্রলাল রায়ের রাগ-নির্ণয় মূল্যবান। স্বরলিপির পুস্তকের সংখ্যাও অনেক। বাংলাদেশ আকারমাত্রিক-লিপি গ্রহণ করেছে। সুরেনবাবু ও দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপির চলনই বেশি।

আনন্দের কথা এই যে একদল যুবক কেবল বাংলা গানই গেয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে একশ্রেণী ঠুংরী, গজল প্রভৃতি তথাকথিত মুসলমানী চালের পক্ষপাতী— যদিও সে চাল নিতান্তই বাজারের, এবং সে কবিতা অত্যন্তই বাজে। অন্য শ্রেণী দেশী সংগীতের ভক্ত। তাঁদের রচনা ও চাল সব সময় উপভোগ্য নয়। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই সুকণ্ঠ এবং গানের অন্তত সাহিত্যিক ভাবটি প্রকাশ করতে যত্নবান। এঁদের মধ্যে অনেকে, বিশেষত কুমার শচীন দেববর্মণ বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতি বাংলা গান গেয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি লোকসংগীত গান না। দেশী ও মার্গ পদ্ধতির রস মিশিয়ে তিনি পরমান্ন পরিবেশন করেন। কীর্তনের ওপরও আজকাল একটা ঝোঁক এসেছে। লোকসংগীতের প্রতি সাধারণের আগ্রহ নিতান্তই আশাপ্রদ। মাটির সঙ্গে সংস্রব ছাড়লে আর্ট মরে শুকিয়ে। নানা কারণে ধ্রুবপদ্ধতিতে ভাঙন ধরেছে। ভাঙনকে সৃষ্টির কার্যে পরিণত করার একটি উপায় হল লোকসংগীতে জ্ঞান ও অনুরাগ। লোকসংগীতের সাহায্যে সংগীতানুরাগের ও সংগীতের শ্রীবৃদ্ধির সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ অন্য প্রদেশ এখনো বাংলার মতন অতটা বোঝে নি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে বাঙালীর অনুরাগের পিছনে আজও

কোনো জ্ঞানের সমর্থন নেই। এখনো বাংলাদেশে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল গান যথারীতি সংগ্রহ হচ্ছে না, এখনো বাংলাদেশে সমালোচনা কেবল ভালো লাগা, না লাগার অনুবাদমাত্র। তবে লেখকের বিশ্বাস, এদেশে শীঘ্রই জ্ঞানের সমর্থনে সংগীতানুরাগ সুদৃঢ় হবে। তখন হিন্দুস্থানী সংগীতের পুনর্জীবন কেবল পুনরাবৃত্তির নামান্তর হবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গসরকারের সাহায্য এখানে নিতান্ত প্রয়োজন। সংগীত সম্বন্ধে তাঁদের কল্পনার অভাব ঊনবিংশ শতাব্দীরই উপযুক্ত। বাঙালী যুবকদের নবজাগ্রত শক্তির অপচয় ঘটতে দেওয়া ঘোরতর অসামাজিকতা।

বাংলাদেশে যা ঘটছে অন্যদেশে তারই অনুকরণ হচ্ছে বললে ভুল হবে। বোধহয় ঘটনাগুলি একই ধরনের সামাজিক শক্তির প্রকাশ। তবে সংস্কারের পার্থক্যের জন্য প্রকাশের তারতম্য হবেই হবে। গ্রামফোন, রেডিয়ো, টকি ও থিয়েটারের প্রভাব একটি প্রদেশে আবদ্ধ নয়। কিন্তু নতুন ভাঙনের শক্তি কোন্ কাজে প্রয়োগ করা হবে তা অনেকটা ঠিক করেন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা। 'প্রদেশ' কথাটি এক্ষেত্রে ব্যবহার করছি একটি বিশেষ কারণে। প্রাণের কথা, সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায়ের কথা, রসের কথা, মাতৃভাষাতেই লেখা সম্ভব। ইংরেজিতে তার আভাসই দেওয়া যায়। যে-সম্পূর্ণ প্রকাশের দ্বারা সৃষ্টি সম্ভব তার জন্য চাই মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ ও ভাতখণ্ডেজী গান সম্বন্ধে যা-কিছু লিখেছেন সবই বাংলায় ও মারহাট্টিতে। আমাদের সংগীত সম্বন্ধে ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখা যায় না, কারণ সংগীতে অনুবাদ চলে না। বোম্বাই প্রদেশেও অবশ্য সকলেই ভাতখণ্ডেজীর প্রভাব স্বীকার করেন না, যেমন বাংলাদেশে অনেকে রবীন্দ্রনাথের গান অবহেলা করেন। কিন্তু গ্রহণ না করাতেও তাঁদের প্রভাব স্বীকৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রধানত ভাঙনে ও সৃষ্টিতে; ভাতখণ্ডেজীর প্রধানত রক্ষায় ও প্রচারে। প্রধানত বলছি এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী পদ্ধতির একান্ত ভক্ত, এবং ভাতখণ্ডেজী পুনরাবৃত্তির পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁকে কিছুতেই সনাতনী ভাবা যায় না। যে যে শক্তির জন্য বাংলাদেশের সংগীত সৃষ্টির অভিমুখী এবং বোম্বাই প্রদেশে উচ্চ-সংগীতের সমধিক প্রচলন, রবীন্দ্রনাথ ও ভাতখণ্ডেজী সেই-সব শক্তির প্রতিভূ, প্রতিনিধি ও প্রকাশ বললে

তর্কের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। ভাতখণ্ডেজীর দান নানাবিধ। তাঁকে লক্ষণ-সংগীতের রচয়িতা, উচ্চ শ্রেণীর সংগীত-রচনার সংগ্রহকার, সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় লিখিত সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থের সম্পাদক ও প্রকাশক, সংগীত-শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তক এবং অন্তত তিনটি সাংগীতিক অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা যায়। মেল ও ঠাট নিরূপণে, রাগিণীর অঙ্গ-নির্ধারণে, শাস্ত্রের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যায়, সন্ধিরাগ প্রভৃতি কূটতত্ত্বের বিচারে তাঁর স্বকীয়তা সর্ববাদি-সম্মত। তবু তাঁর মতন উদারচেতা ব্যক্তি দুর্লভ। তাঁর কৃপায় আজ উত্তর-ভারতে উচ্চসংগীতের প্রতি অনুরাগ বেড়েছে নিশ্চয়, কিন্তু বড়ো বড়ো ওস্তাদ যে তাঁর ভীষণ বিপক্ষে এইটাই হল তাঁর যথার্থ পরিচয়। বোম্বাইয়ের বিষ্ণুদিগম্বর একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, অসাধারণ গায়ক ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দ পঞ্জাব, বোম্বাই এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বিশেষত এলাহাবাদে, শিক্ষা দিচ্ছেন। শেষ জীবনে তিনি ভজনই গাইতেন। তাঁর প্রবর্তিত কোনো বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি কিংবা নূতন মতের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। জ্ঞানী সমাজ, গান্ধর্ব বিদ্যালয় প্রভৃতি অনুষ্ঠান, মিরাজের মতন সংগীতশিক্ষার কেন্দ্র এবং আবুল করিম, আলাদিয়া, বিলায়েৎ হোসেন, মুন্ধে খাঁ, কৈসর বাই প্রভৃতি বড়ো বড়ো ওস্তাদ থাকার দরুন বোম্বাইয়ের নাটকী, গ্রামোফোন ও টকি সংগীতের ধরনও বাংলাদেশের চেয়ে অনেক প্রাচীন পদ্ধতি-ঘেঁষা।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগীতের আজ যে বিস্তার হচ্ছে তার জন্য প্রধানত দায়ী অন্য এক প্রকারের নতুন শক্তি, অর্থাৎ সেই রাজশক্তি এবং সেই পুরাতন সামাজিক আভিজাত্যবোধ। পশ্চিমাঞ্চলে বড়োলোকের মধ্যে বরাবরই সংগীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। আজ যে সেটি আবার জাগ্রত হয়েছে সেজন্য মন্ত্রী রাজেশ্বর বলী এবং তাঁর ভাই উমানাথ বলী, রাজা নবাব আলি, কাশীর রাজা মতিচাঁদ, কৃষ্ণদাস এবং সন্তবাবু, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাতখণ্ডেজী এবং লক্ষ্ণৌয়ের ম্যারিস্ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকারের নিকট সকলের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের মতো কোনো উচ্চ-শ্রেণীর সংগীত-রচয়িতা আজকালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নি। তাই সেখানে এখন জনসাধারণের মধ্যে অনুরাগ-বিস্তারের যুগ শুরু হয়েছে, এখনো অনুকৃতির

যুগ চলছে। এলাহাবাদের অনুষ্ঠানে বিষ্ণুদিগম্বরের এবং লক্ষ্ণৌয়ে ভাতখণ্ডেজীর প্রভাব। দুই শহরেরই ওস্তাদবৃন্দ মারহাট্টি। ভাতখণ্ডেজীর অনুষ্ঠানে গোয়ালিয়রের ঢঙ অর্থাৎ তান কর্তবের ব্যবহার বেশি ও মীড়ের প্রয়োগ কম। নতুন যেন লুকিয়ে রয়েছে এই প্রদেশে।

মান্দ্রাজ এখনো হিন্দুস্থানী পদ্ধতির প্রধান অলংকার অর্থাৎ মীড় পর্যন্ত গ্রহণ করে নি। যদিও একাধিক ওস্তাদ হিন্দুস্থানী পদ্ধতির অন্যান্য অলংকার গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠেছেন। স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার জন্য পল্লব ও মীড়ের সংমিশ্রণ শীঘ্র সম্ভব কিনা বলা যায় না, তবে মান্দ্রাজী সংগীতজ্ঞের মধ্যে একদল সংমিশ্রণের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন শোনা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশে চলতি কথার সাহিত্য তৈরি হচ্ছে শুনেছি— সেইসঙ্গে 'হরিকথা'র মারফত কথিত ভাষায় সংগীতরচনাও হওয়া সম্ভব।

অতএব, সমগ্র ভারতবর্ষে সংগীতের প্রতি অনুরাগের দুটি দিক চোখে পড়ে— পুনরুদ্ধার ও নতুন সৃষ্টি। এই দুটির আশ্রয়ে সংগীত সম্বন্ধে দুটি প্রধান মত তৈরি হচ্ছে। একদল বলছেন, পুরাতন পদ্ধতির এতই উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল যে তার বেশি উন্নতি অসম্ভব, অতএব পুরাতন পন্থায় চলতেই হবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে বলছেন, প্রাদেশিক ভাষা ও কৃষ্টির অভাব অনুসারে নতুন রচনা হোক। বাংলাদেশে এই মতটারই প্রসার অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশি। রবীন্দ্রনাথ এই মত সমর্থন করেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা উচ্চ-সংগীতে অভিজ্ঞ, তাঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি বলেছেন যে খেয়ালের হিন্দুস্থানী ঢঙ বাংলাভাষায় আনা যাবে না, কারণ বাংলায় স্বরবর্ণ কম, ব্যঞ্জন ও যুক্তবর্ণ বেশি, সুতরাং তান দেওয়া বাংলাগানে অসম্ভব। রবীন্দ্রলাল রায়ের এই মত। দিলীপকুমার বলেন যে বাংলাগানে তান খুব চলবে এবং রচনায় তান দেবার স্বাধীনতা থাকা চাই। সংগীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্যপ্রদেশে কোনো আলোচনা হয় বলে আমার জানা নেই। সে যাই হোক্— নানা কারণে বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব। বাঙালী বোধহয় কখনো অন্ধ অনুকরণ করতে পারে নি ; স্বভাবের দোষে নয় ইতিহাসেরই আশীর্বাদে। তবে সংগীত আসরে স্ত্রীজাতির অভিযানের ফলে কী হবে বলা যায় না।

এই ভারতীয় প্রতিবেশে আমাদের কৃষ্টির আলোচনাই যথার্থ। এই পারিপার্শ্বিকেই রবীন্দ্রসংগীত বিচার্য এবং উপভোগ্য। কথা ও সুরের সম্বন্ধের বেলা তো কথাই নেই।

কথা ও সুর

মতামত

আমি গান সম্বন্ধে যে লিখছি তার প্রধান কারণ আমার নিজের মতামত ঠিক করা। সংগীত বিষয়েও যে মতের প্রয়োজন আছে, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। বাহবা দিয়েই ক্ষান্ত হতে লজ্জা পাই। যা শুনে এসেছি এতকাল, কিংবা যে-ওস্তাদের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁর গানই সব চেয়ে ভালো বলতে অন্য রকমের শিক্ষায় বাধে। সংগীতে যত পারদর্শী হলে সংগীত সংক্রান্ত মতামত মূর্খতা ও গোঁড়ামির নামান্তর হয়, ততটা ওস্তাদ আমি নই। যতটুকু জানলে সংগীতের প্রাণের কথা খানিকটা বোঝা যায় ততটুকু জ্ঞান আমার আছে। চিরজীবনই উচ্চ-সংগীত শুনছি, ছেলেবেলায় পিতার আজ্ঞায় ধ্রুপদ ভিন্ন খেয়াল শোনাও বারণ ছিল, ঠুংরি টপ্পা তো দূরের কথা! যাত্রা শোনায় কর্তাদের আপত্তি ছিল না। গত পনেরো-কুড়ি বছর ধ্রুপদ ভিন্ন অন্য উচ্চ-সংগীত ও দেশী-সংগীত শোনবার সুযোগ হয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু পড়েছি ও তার অনেক বেশি আলোচনা করেছি। ফলে, আমার মাথার মধ্যে দু-তিনটি বিরোধী মত বসবাস করেছে, সন্দেহ হয়। অবশ্য, বিরোধের মধ্য দিয়েই চিন্তার সমন্বয় সম্ভব। মানসিক পীড়াগ্রস্ত রোগী নিজে যদি রোগের প্রকৃত কারণ বুঝতে পারেন তবে তিনি নিজেই সুস্থ হতে পারেন। তাই আজ গান বাজনা অল্প জেনে, ওস্তাদ না হয়েও, বিরোধের নির্বাণ প্রাপ্তি ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সংগীত সম্বন্ধে লিখতে বসেছি। লেখা ছাপাবার উদ্দেশ্য এই যে, আমার মতন অনেক অর্ধমূর্খ, অর্ধপণ্ডিত সংগীতপ্রিয় লোক আছেন যাঁরা মার্গ, দেশী ও আধুনিক সংগীত সবই শুনতে চান ও ভালোবাসেন, অথচ যাঁদের মতামতকে সাজাবার, বিচার করবার, সমন্বিত করবার অধ্যাপকসুলভ অবকাশ ও সুযোগ

নেই। তা ছাড়া, জনকয়েকের স্বভাবই হচ্ছে ভাবগুলিকে ভাসমান অবস্থায় না রেখে দানা বাঁধাতে চাওয়া।

একটি মত হল এই : গানে কথা অর্থাৎ কবিতা চাই। সেই কবিতার ভাবার্থ নিয়ে সুর বসাতে হবে। কবিতায় যেখানে করুণভাবের বিকাশ হচ্ছে সেখানে কোমল পর্দা কিংবা কোমল স্বরের গুচ্ছটি লাগিয়ে সুরটিকে মোলায়েম করতে হবে। অথবা কবিতাটি যদি আদিরসাত্মক হয় তা হলে চটকদার সুরে (ও তালে) গাইতে হবে। 'মজাদার' কবিতা মালকোষ কিংবা ললিতের মতন ভারী রাগে গাওয়া চলবে না, তার জন্য পিলু বারোঁয়া, কাফি প্রভৃতি রয়েছে ; করুণ কবিতার জন্য দেশ, পূরবী, আর গুরুগম্ভীর রচনার জন্য ভেঁরো, কানাড়া ইত্যাদি। কেননা, সুরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতার ভাবকে ফুটিয়ে তোলা। সেইমতো তাল ও লয়ও চলতে বাধ্য।

অন্য মত এই : সুর যদি কবিতার ভাব ফোটাতেই ব্যস্ত হয় তবে সুরের নিজস্বতা ও সার্থকতা কতটুকু রইল ? অথচ সেটা রয়েছে আমরা সকলেই জানি। লোকে তান দেয় কেন, সেতার বাজায় কেন ? সুর হয় সুর, না-হয় বে-সুর। সুরের একমাত্র কাজ নিজের তাগিদে বিকশিত হওয়া। কবিতা মনের এক স্তরের, এক ধরনের ভাব-সমাবেশের ভাষা, সুর অন্য স্তরের। প্রকাশ করবার প্রবৃত্তির ভিত্তি ছাড়া এ দুই ভাষার কোনো প্রাথমিক সম্পর্ক নেই। আর যদিও থাকে, তবে রাজকার্যে ব্যবস্থাপন, শাসন ও বিচার পদ্ধতি পৃথক করাই যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল কথা, তেমনই কবিতা ও সুরের সম্বন্ধটি বিচ্ছিন্ন করাই কবিতা ও সুরের স্বাধীন উন্মেষের পক্ষে সমীচীন। যেমন হিব্রু দিয়ে গ্রীক বোঝানো যায় না, তেমনি সুর দিয়ে কবিতা কিংবা কবিতা দিয়ে সুর বোঝানো যায় না। সুর কবিতার তরজমা নয়।

এ দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী, অথচ একই শুচিবাইগ্রস্ত মনোভাবপ্রসূত

মতের মাঝামাঝি আর-একটি মত আছে। সেই মতানুসারে, যেখানে — যেমন রবীন্দ্রনাথ, কি অতুলপ্রসাদের গানে— সুর ও কবিতা হরগৌরীর মতন অঙ্গাঙ্গীভাবেই মিলিত রয়েছে, সেখানে এমন একটি বিশেষ রস সৃষ্টি ও সঞ্চারিত হচ্ছে, যেটি না-কেবল সুরের না-কেবল কবিতার, অথচ দুইয়ের মিলনের একটি অতিরিক্ত ফল। তার ভিন্ন নাম দেওয়াই ভালো— সংগীত।

আমার বিপদ এই যে, ভালো সুরে বসানো ভালো কবিতাও শুনতে ভালো লাগে, শুদ্ধ সুর শুনতেও ভালো লাগে, এবং সংগীত শুনলেও প্রাণটা উদাসী হয়, নেচে ওঠে। বুদ্ধির দিক থেকে মানি যে সুরের রস সাধারণত সাহিত্যের রস থেকে পৃথক। প্রতিভান্বিত ব্যক্তির পক্ষে সব মিলনই সম্ভব, তাও আমার অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। কিন্তু মোটামুটি বলা যায়, বাংলাদেশে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল, যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে সুরের যে ধারা এতদিন বয়ে এসেছে সেটি সাহিত্যের দ্বারাই পুষ্ট। সেখানে আবার ধর্মভাব সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করার দরুন সুর নিতান্তই লুকিয়েছিল। কীর্তনে যে ভারী সুর নেই, সুরতালের কেরামতি নেই বলছি না। তবে কীর্তনের প্রধান আবেদন সাহিত্যের ও ধর্মের এ কথা সুনিশ্চিত। ধ্রুপদ-খেয়ালে অভ্যস্ত কানে কীর্তনের সুর বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীর স্মৃতি জাগ্রত করে বলেই আদর পায়। দেশী-সংগীতের নিজস্ব যেগুলি টান কি খোচ কি ছন্দ আছে তার সাংগীতিক মূল্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বটে, তবু তুলনামূলক বিচারে অনেকেরই কাছে তার সুরগত মূল্য কম।

অবশ্য সাহিত্যের, বিশেষত কবিতার দৌরাত্ম্য সব দেশের সব আর্টের ওপরই দেখা যায়, কারণ মুখের ভাষাটাই সবচেয়ে পুরাতন ও কর্মজীবনে ব্যাপক। য়ুরোপেও চিত্রকলা ভাস্কর্য স্থাপত্য ও সুরকে সাহিত্যের অধীনে থাকতে হয়েছিল, আর এখনো কোনো আর্ট সাহিত্য থেকে ছাড়পত্র পায় নি। আজকাল মুক্তির চেষ্টা ভীষণ

ভাবে চলছে, তাই অনেকে আধুনিক চারুকলা বুঝতে পারছেন না। ধর্মের আধিপত্য সম্বন্ধে বলা যায় যে ভগবানের কৃপায় এখন সব দেশেই তাঁর প্রতিনিধি পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা কমে আসছে, এবং প্রত্যেক চারুকলাই পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানদের মতন নাস্তিক হয়ে উঠছে। আমার বিশ্বাস, ধর্মের প্রভাব কমলে সাহিত্য, ধর্ম ও সাহিত্যের প্রভাব কমলে চিত্রকলা, ধর্ম ও সাহিত্য ও চিত্রের প্রভুত্ব হ্রাসে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও সুর ক্রমিকভাবে স্বাধীন হয়। সাবালক জমিদারপুত্র অল্প কয়েকদিন উচ্ছৃঙ্খল থাকে, পরে কেউ কেউ সামলে যায়, এবং তারাই হয় প্রকৃত জমিদার। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে চিরকাল থাকার চেয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার ভেতর দিয়ে স্বাধীন হবার আশা ও সম্ভাবনা বেশি। যখন প্রত্যেক আর্ট নিজের মৌরসী বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে সজ্ঞান তখনই তার সার্থকতা কিন্তু এইখানে আরেকটি কথা বলা দরকার। স্বাধীনতা অর্জনের পর পরিত্যক্ত সম্বন্ধের সাথে মৈত্রী স্থাপনের দিক আছে। সেটা চোখে পড়ে যখন 'বিশুদ্ধ' আর্ট জীবন থেকে বিযুক্ত হয়েছে লোকের ধারণা হয়।

এ-তো গেল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত। শ্রোতার প্রাণ সব সময় বুদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না সকলেই জানে। মস্তিষ্কের শিরাগুলো প্রায়ই ঝুলে পড়ে, যতই কেন সেই মস্তিষ্কের অধিকারী পণ্ডিত ব্যক্তি হোন না। আমি সাধারণ শ্রোতা, তাই আমার মতন লোকের পক্ষে সাহিত্যের সাহায্য প্রায় চিরকালই নিতে হবে, অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সংগীত-অলংকারের নতুন ভাষা সৃষ্টি হচ্ছে এবং সে ভাষা কথিত ভাষারই মতন স্বাভাবিক ও সহজবোধগম্য না হচ্ছে। তা এখনো হয় নি। অর্থাৎ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছি। তার মধ্যে আশা এই জ্ঞানটুকু যে সুরের রস কবিতার রস থেকে বিভিন্ন হলেও মহারথীরা মিশিয়েছেন, এবং মধ্যে মধ্যে, যখন সুরের রস

শুকিয়ে গিয়েছে, তখন সুরের প্রাণসঞ্চারের জন্য জীবনের সেই আদিম বিকাশবৃত্তির উৎস থেকেই জল নিয়েছেন। নবজীবন সঞ্চারের সময় আদিম অবস্থার সেই প্রাণময় অভিন্নতা স্বীকার করাই সকল সৃষ্টির ধর্ম।

জানি মহারথীদের রচনায় দুটি রস মিশেছে। এবং তানসেন যেকালে পেরেছিলেন তখন ডিমক্রেসির যুগে অন্য লোকের চেষ্টা করবার নিশ্চয়ই অধিকার আছে। এ দুটি কথা মানবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তর্কবুদ্ধি জেগে ওঠে। গায়ক, ও সুর-রচয়িতা কেন কবিতায় বর্ণিত করুণ ভাবের পায়ে কোমল পর্দার বেড়ি ও বীরভাবের কপালে শুদ্ধ স্বরের জয়টিকা পরাবেন? কেন মিষ্টি কবিতায় দেশ, গম্ভীর কবিতায় কেদারা, সাত্ত্বিক কবিতায় ভৈঁরো বসবে? পরীক্ষা করে দেখে ড. ভ্যালেনটাইন লিখেছেন : We may suppose that the custom of setting sad songs to minor keys originated without any felt suitability of the key to the ideas, but that gradually, by repetition, we have come to connect the two, so that a piece of music in a minor key now usually appears to us sad or plaintive. There is nothing inherently sad about the minor key. অর্থাৎ কোমল পর্দার কোমলত্ব আমাদেরই আরোপ, আমাদেরই অভ্যাস। শুধু তাই নয়, কারো কারো কাছে সুর কোমল কিংবা কঠিন ধরাই পড়ে না। এও পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে স্বর সম্বন্ধে মানুষ সাধারণত পাঁচ রকমের বিচার করে থাকে, অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের শ্রোতা আছে। প্রথম, subjectively, যেমন স্বর শুনে গায়ে কাঁটা ওঠা, কি সুড়সুড়ি লাগা। দ্বিতীয়, associatively, একটা স্বর শুনে সদৃশ কোনো শব্দের স্মরণ হওয়া; যেন ঘণ্টা বাজছে, ঝরনা বইছে, ইত্যাদি।

তৃতীয়, objectively, যেমন স্বরটি বেশ গোলগাল, মোলায়েম। চতুর্থ, character ঘটিত, ব্যক্তিগতভাবে, যেমন স্বরটি নিরাশায় ভরা, তেজী, নিরীহ, সাত্বিক প্রভৃতি। পঞ্চম, associative other than musical, যেমন রামায়ণ শুনে রামছাগলের কথা মনে হওয়া। এই রকম ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলির দ্বারাই সুরের সৌন্দর্য বিচার হয়। পরীক্ষকের মতে চতুর্থ বিচারই শ্রেষ্ঠ এবং এই শ্রেণীর শ্রোতাই সত্যকারের সুররসিক।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু উপায় নেই, বিশেষত যখন সাপটি অবান্তর নয়। ১৪৬ জন শ্রোতা নিয়ে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে ছেলেদের মধ্যে পাঁচ জন এবং মেয়েদের মধ্যে পনেরো জনের মনের উপর স্বরের কিছু প্রভাব থাকলেও মুখে ব্যক্ত করবার ক্ষমতা নেই। বিদেশী ভাষাতেই অদ্ভুত ও অপ্রিয় সিদ্ধান্ত পেশ করছি: If we increase the number of judgments given by the men proportionately, for the sake of ready comparison with those of the women, we find that in the highest type of judgment (character), the men surpass women by 10 per cent, whereas the women give 10 per cent more of the lowest type of judgment than do the men...(সাধে কি মেয়েরা অবৈজ্ঞানিক !)...The fact that women concern themselves more than men with music (for example, as regards the taking of lessons in the playing of piano) is perhaps a matter of convention, and is not due to any greater sensitiveness to music, at least so far as individual tones are concerned. মেয়েরা যে গান শেখেন ফ্যাসানের কিংবা বিবাহের জন্য এ ধরনের ইঙ্গিত আমি অগ্রাহ্য করি। ও-রকম কটু

কথা শুনতে হলে মানতে হয় যে character typeই শ্রেষ্ঠ শ্রোতা। কিন্তু ঐ ইংরেজি শব্দটির অর্থ মনোভাব ব্যক্ত করবার ক্ষমতা ছাড়া আর কী? মেয়েরা আজকাল নভেল, গল্প, এমন-কি গদ্য কবিতা লিখলেও মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারেন না কে না জানে? তা ছাড়া পূর্বোক্ত মন্তব্যের শেষাংশে এক-একটি স্বরেরই উল্লেখ আছে, এবং সুর স্বর-সমষ্টি ছাড়া আরো কিছু হতে পারে। মেয়েরা না-হয় শুদ্ধস্বর বোঝেন না, গাইতে বাজাতে পারেন না, তাতে কিবা আসে যায়, যদি তারা সুরের রূপটিই পরিগ্রহ করতে পারেন। যৎসামান্য অবশ্য একটু আসে যায় যখন গায়িকা সংগীতে কবির প্রতিভূ হয়ে ওঠেন, নিজেদের সুরের জগতে কবিতার বিষয় ও প্রতিনিধি ভাবেন। কিন্তু এ প্রকার আসা-যাওয়ার দাম সুরের দিক থেকে এতই কম যে তার সম্বন্ধে বেশি বিচার করা অন্যায়। সোজা কথা এই, সুরের স্তরে মেয়েরা অবতীর্ণা হয়ে শ্রোতার মনে কবিতা-প্রীতি জেগেছে, সুর ও কথার পার্থক্য ঘুচেছে— কেবল তাই নয়, আরো অনেক কিছু সম্ভব হয়েছে যেটা জীবনযাত্রার জন্য নিতান্ত আবশ্যক। তাঁদের কাছে সংগীত-রসিক মাত্রেই কৃতজ্ঞ। মাত্র-সুররসিক বড়োই গোঁড়া, একপ্রকার বে-রসিক, তাঁর কাছে ব্যক্তিগত রূপ, রস অবান্তর।

সে যা হোক, পরীক্ষাগুলি থেকে বোঝা গেল যে সকলেই এক স্বর কি সুরকে কোমল বলতে বাধ্য নয়। যা আজ অত্যন্ত কটু ঠেকছে শুনতে শুনতে পরে তাও ভালো লাগতে পারে। একটি স্বর কি সুরের অর্থ প্রত্যেকের কাছে, একই ব্যক্তির কাছে সব সময়ে একই হবে, অন্তত একই ভাবে ব্যক্ত হবে তাও নয়। তার ওপর তাল রয়েছে। তথাকথিত করুণ সুরও খেমটা কি কাহারোয়াতে চুটকি ঠেকে, আর পিলু, ঝিঁঝিঁট খাম্বাজের মতন সাদাসিধে রাগিণীও বড়ো তালে বসিয়ে গাইলে গম্ভীর শোনায়। শ্রোতার মনে এতরকম

বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া থেকে কি প্রমাণ হয় না যে সুর যে ভাবটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করে ঠিক সেটি কথিত ভাষায় অব্যক্ত? অন্তত সেটি যদি কবিতায় যথাযথ প্রকাশ পায় তবে কবিতাটি এত সার্থক ও সম্পূর্ণ হল যে সংগীতের সাহায্য সে ভিক্ষা করে না? রস-বস্তু টাকা নয় যে অধিকন্তুতে দোষ বর্তায় না। কথা থামলে সুর শুরু হয়।

সাহেবের কথা এদেশে খাটে না বললে চলবে না। হিন্দুস্থানী সুর-পদ্ধতি নিশ্চয়ই বিদেশী সুর-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন, বিশেষত বিন্যাসে। কিন্তু পরীক্ষার বিষয় স্বরবিন্যাস নয়, সাধারণ মানুষের মনের 'পরে স্বর ও বিরামের প্রভাব। মানুষের মোটামুটি ভাবধারাগুলি প্রায় সর্বত্রই সমান, কেবল সংস্কৃতি অনুসারে তাদের রূপ ভিন্ন। সাধারণ অশিক্ষিত শ্রোতার প্রবৃত্তি প্রায় সর্বত্রই সমান, এবং স্বর সেই প্রাথমিক ভাবধারা ও প্রবৃত্তিকেই নাড়া দেয়। একটি স্বরের কম্পন ভারতেও যা বিদেশেও তাই, যদিও তার ব্যবহার ভিন্ন। যদিও স্বীকার করা যায় যে সব সাহেবই পাজি, তবু মানতে হবে যে বিলাতী সংগীতে, যেখানে কোনো রচনা ঘুম ভাঙিয়ে প্রাণকে আশান্বিত করে, কোনো রচনা শুনে আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়, যেখানে কান্না, হাসি, পাখির ডাক, সমুদ্রের গর্জন, ঘোড়ার হ্রেষারব, বেড়ালের মিউ মিউ পর্যন্ত শব্দের অনুকরণে বাধা নেই— সেখানেও যখন কোমল পর্দার সাহিত্যিক কোমলতা নেই, সেখানেও যখন কোনো একটি স্বর সকলের কাছে এক অর্থ বহন করে না, তখন আমাদের হিন্দুস্থানী সুর-পদ্ধতির মতন অত অ-বাস্তব, অ-পার্থিব, সূক্ষ্ম চারুকলার কাছে সাহিত্য-রসের প্রত্যাশা করলে, তার সঙ্গে কবিতার রস মিশিয়ে দিলে, তার সাহিত্যের সমর্থন প্রয়োজন আছে, কিংবা তার সাহায্যে সাহিত্য-রসের উদ্রেক হয় স্বীকার করলে আমরা সাহিত্য-রসিক ভিন্ন সুরের প্রেমিক প্রমাণিত হব না। 'সাহিত্যিক ভাব' বলতে আমি সাধারণ ভাবই বুঝি, যেমন ভালোবাসা, মান-অভিমান, করুণা, রাগ,

হিংসা প্রভৃতি— অর্থাৎ যেগুলি নিয়ে সাহিত্য এতদিন কারবার করে এসেছে, যেগুলি, এক হিসেবে, সাহিত্যিকেরই সৃষ্টি। তাদের আলোচনা স্থগিত রাখছি। এইখানে একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে জানি— সুরের expression ও-সব ছাড়া তবে কি? সেটা কী পরে বিবেচ্য। সেটা কী নয় কল্পনা করা যায়— মুখভঙ্গি নয়, ভাও বাতানো নয়, দেহের সাহায্যে কবিতাকে প্রথমে ফুটিয়ে তুলে সেই কবিতার সঙ্গে সুরের অলংকার পরানো নয়।

প্রথম মতের সঙ্গে আমার গরমিল এই পর্যন্ত। মিলের কথা স্মরণ করি আবার। অত্যন্ত পুরাতন ও পূর্বপরিচিতকে না ভালো-বেসে যে থাকতে পারি না। যে কথিত ভাষাকে বাল্যকাল থেকে প্রথমভাগের ভেতর দিয়ে জানি সেটা আমার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। কথার শেকড় অতিদূর পর্যন্ত ছড়ানো। কথার সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ, কাজের সম্বন্ধ, জীবনযাত্রা চালাবার সম্বন্ধ সুরের চেয়েও নিকটতর। মনে যত ছবি ভেসে ওঠে তার অনেকগুলিই ভাষায়, কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। অনেকের মতে আবার যা ভাষায় ব্যক্ত হয় না তার অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই, সকলের পক্ষে না হোক, সর্বসাধারণের পক্ষে তো বটেই। মানুষের উপভোগকে চিরে চিরে ভাগা দেওয়া অসম্ভব। অনুভূতিটা অখণ্ডরূপেই আসে, উপভোগও সেইমতো আসে অনেক সময়। হিন্দুস্থানী ভাষায় ওস্তাদী গান শোনবার পর যদি কেউ বাংলা গান গায়, তা হলে শ্রোতারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, কারণ এতক্ষণ বাদে পূর্বপরিচিতের সাক্ষাৎলাভ হল। এ তৃপ্তি অন্যায় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? সুরও আমরা চিনি অবশ্য— কিন্তু বিদেশিনীকে চিনি চিনি বললেই কি ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলা উচিত, না ঘরের লক্ষ্মীর পদযুগল পূজা করতে বসবেন? এই ঘরের লক্ষ্মীটি বড়োই খামখেয়ালী।

তবু যেন সন্দেহ থেকেই যায়। না-হয়, আমরা কথিত ভাষার

কবিতার সাথে পরিচিত ও বন্ধুকে দেখলে সকলেরই ভালো লাগে। কিন্তু, পরিচয়ই কি পরিচিতের প্রকৃতি বদলে দিতে পারে? এমন মানসিক অবস্থা কল্পনাতীত নয় যার প্রকৃতি ও রূপ কবিতাতেও ধরা পড়ল না। তখন কবিতা অবান্তর নিশ্চয়ই। ভাতের খিদে রুটিতে যায় কি? পূর্বপরিচয় সবক্ষেত্রেই আনন্দের মাত্রা বাড়ায় নিশ্চয়, তার জন্য আমরা সুরও বেশি উপভোগ করি, যেই বুঝলুম ওস্তাদ দরবারি কানাড়া গাইছে অমনই বাহবা দিলাম। সকলেই জানেন যে বড়ো ওস্তাদরা পর্যন্ত সাধারণত পঞ্চাশ-ষাটখানি সুর নিয়ে নাড়াচড়া করেন, এবং বছর খানেকের মধ্যেই বোধহয় সেগুলিকে অন্তত চেনা যায়। এই কয়টি রাগ-রাগিণী সুপ্রচলিত থাকার দরুনই তাদের সঙ্গে সাধারণ সুরপ্রিয় শ্রোতার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার ফলেই সুরের নাম আবিষ্কারের পরমুহূর্ত থেকেই স্বরবিন্যাসের দিকে তাঁদের বেশি নজর পড়ে। কারণ, familiarity breeds contempt, অর্থাৎ ঘরের লক্ষ্মী ঘোমটা টানেন না। তখনো পরিচয়ের জের চলে, তবে অন্যস্তরে। যেমন ধরা যাক, ভীমপলাশির গান নীচের কোমল নিখাদ থেকেই শুরু হয় সাধারণত, একটি গান আছে যেটির ওপরের নিখাদ থেকেই আরম্ভ হয়। তখন অ-পরিচয়ের খট্‌কা লাগে, সন্দেহ হয় ভীমপলাশি নয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই ণ্বি সা গ্বা মা পা পকড়টি না পাওয়া যায়। পাবার পর ভীমপলাশি বোঝা গেল, ও তখন নতুন সুরপদ্ধতির বিচার শুরু হল। তার পরও বিচার চলে, অপ্রত্যাশিত, অপরিচিত স্বর-বিন্যাসের সঙ্গে অভ্যস্ত স্বর-বিন্যাসের তুলনার ফলে একটা রায় জাহির হয়— ভালো কিংবা মন্দ। পরিচয়ের মোহ ত্যাগ করার পর যে রায় দেওয়া হয় তার মধ্যে বিচার-বুদ্ধির ছাপ নিশ্চয়ই বেশি। এখন, নতুন সুর-রচনা রোজ শোনা যায় না, অথচ নতুন ও বিচিত্র কবিতা তার চেয়ে বেশি ছাপা হচ্ছে। সেইজন্য, অর্থাৎ নতুনের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুবিধার

তারতম্যের জন্য, যে ব্যক্তি কবিতাও পড়েন, গানও শোনেন, তাঁর বিপদ হয়। অতএব যদি কোনো গায়ক কোনো নতুন ধরনের বাংলা কবিতা পুরাতন সুরে গান, তা হলে তিনি ভাষার তরফ থেকে আনন্দ দিতেও পারেন, কিন্তু সুরের দিক থেকে পূর্ব-পরিচিত সুরের ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারছেন না। যদি দিতে চেষ্টাও করেন তবে আমরা সুরের বিকাশই প্রত্যাশা করব, কথার মাধুর্যকে অবহেলা ক'রে। মানুষের মন একই সময় দুটি ভিন্ন দিকে সমান-ভাবে নজর দিতে পারে না। চেষ্টার ফলে গায়ক জোর এই প্রমাণ করবেন যে তিনি একজন স্বভাষাভক্ত বাঙালী। তিনি একজন সুগায়ক ও আর্টিস্ট প্রমাণ করতে হলে সুরের প্রতি তাঁকে ঝোঁক দিতেই হবে, একটি পরিচয়ের তৃপ্তিকে জলাঞ্জলি না দিয়ে তাঁর উপায় নেই। সত্যকারের উৎকৃষ্ট কবিতা ওস্তাদীভঙ্গিতে পরিচিত সুরে গাওয়ার ও শোনার গলদ এইখানে। দুটি ভাবের কাটাকুটি হওয়া সম্ভব।

তা হলে, দ্বিতীয় মতের সঙ্গেই আমার মিল বেশি রয়েছে দেখছি। তবু স্বীকার করি যে এই মতের পিছনে আছে রসভাগ, রসভোগ নয়। রসভাগ চুলচেরা বুদ্ধির কথা, রসভোগ একটি অবিভাজ্য অভেদ্য অখণ্ড অনুভূতি যার মধ্যে বুদ্ধি, বৃত্তি, ইচ্ছার ক্ষণিক ক্রিয়া একত্রে সাজানো রয়েছে। কেবল তাই নয়, তার অনুভূতি কেবল আমার নয়, আপনার নয়, প্রত্যেক মানুষের, সর্বসাধারণের, সার্বজনীন ব্যক্তিত্বের, মানবসমাজের। তার ঐক্যকে পরে বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু অভিজ্ঞতা হিসেবে সেটি নিতান্তই একমাত্র। দিল্লীতে হুমায়ুনের কবর দেখলাম, ভালো লাগল। বন্ধু যখন সন্ধ্যা-বৈঠকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ভালো লাগল? তখন সেই একক অভিজ্ঞতাকে ভেঙে, গম্বুজের সঙ্গে সম্মুখের, ভিত্তির সঙ্গে উচ্চতার রূপগত সম্বন্ধে যে কত পরিপাটি তাই বোঝালাম। বানু বেগমের পতিভক্তি, লাল

ও সাদা পাথরের ব্যবহারের ইতিহাস, কিংবা দিল্লীর সেই মোগলাই খুশবুর— কোনো কিছুর উল্লেখ করলাম না। কিন্তু যখন কবর দেখছিলাম, তখন তাকে হুমায়ুনের কবর বলেই জানতাম, হুমায়ুন কত বড়ো রসিক কদরদান ছিলেন তাও জানতাম, তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁর প্রতি আমার দরদ ছিল, এবং বানু বেগমকে তাজের স্বামীর মতনই শ্রদ্ধা করছিলাম। কেবল তাই নয়, স্থপতিবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির বচনগুলিও আমার অজানা ছিল না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রূপের আদরও করছিলাম। গোটাকয়েক ঐতিহাসিক তথ্য ও অবাস্তর তত্ত্ব আমার রূপভোগের সঙ্গে মিশেছিল। ছোটো ও সুন্দরী মেয়ের ভালো গান শোনার মধ্যেও খাদ থাকে, যেমন থাকে বৃদ্ধ খানদানী ওস্তাদের পাকা গান শোনায়। এই রকম আর্টের-পক্ষে-অবাস্তর মনোভাবকে দূর করা উচিত বলা যত সোজা কাজে ততটা নয়। ঐতিহাসিক তথ্য না-হয় দূর হয়— আজকালকার প্রত্যেক সায়েন্স গ্রাজুয়েট অবলীলাক্রমে তা পারেন, কিন্তু বাংলা গান শুনব অথচ তার কথা শুনব না, এবং সে-কথা ভালো কবিতা হলে তার রসকে ভিন্নজাতীয় বলে কানের বাইরে হরিজনদের মতন দাঁড়িয়ে থাকতে বলব— এ আমি পারি না— সাফ কথা এই। ওরকম রসভাগ বুদ্ধির চিহ্ন নয়, অস্বাভাবিক মনের চিহ্ন, যে মন কথায় কথায় 'ভর' পায়, কথায় কথায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। নতুন-মনস্তত্ত্ব-বিদ বলছেন, আমাদের মন সভ্যতার তাড়নায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান, এখনো সভ্য হতে দেরি আছে। যদি কখনো ঐরকম শহুরে কিংবা দরবারী সভ্য আমরা হই, তখন না-হয় রস উপভোগের সময় কথার দাবি মানব না, তখন অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ও কীর্তনের পদ, মায় তানসেনের অনেক গানও পুড়িয়ে ফেলব, আসরে কেবল তেলানা আর যন্ত্রই শুনব। ভালো কথা, কবিতায়ও, ন্যায়ত, আমরা তখন মিল কি ছন্দ, সুরের

কোনো প্রকাশ রেশও প্রত্যাশা করতে পারব না। চিত্র হবে জ্যামিতিক, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য হবে যান্ত্রিক, তাই ভালোবাসতে হবে, আর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' উচ্চারণ করা হবে পাপ···কেবল ক্ষণিকবাদ, আর কোটি কোটি দেবতার পৃথক পূজা চলবে। মজা এই, যাঁরা সুরের স্বাতন্ত্র্য মানেন তাঁরা কবিতায় ঝংকার, চিত্রে গল্প চান, দেবদেবী মানেন, আবার ধর্মে বৈষ্ণব হতেও তাঁদের বাধা নেই। একটির স্বাতন্ত্র্য মানতে হলে অন্যের স্বাতন্ত্র্যকে খাতির করতে হয়। না খাতির করলে আত্মা-টাত্মা কিছুই থাকে না।

তৃতীয় মত হল এই : যে কথা ও সুরের মিলনের কালে একটি নতুন রস উৎপন্ন হয়, সেটি কথারও নয়, সুরেরও নয়। কথা ও ভাবের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, এবং সুর হিসেবে শুদ্ধ না হলেও যে অতুলনীয় সুর রচনা সম্ভব তার প্রমাণের অভাব নেই। আবার কবিতা হিসেবেও চমৎকার ও সুরও শুদ্ধ, অথচ দুয়ে মিলে একটি অভিনব মধুর রচনা হল না, তারও দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। এই নতুন সৃষ্টিকে সংগীত বলাই ভালো। আনন্দ দেবার ক্ষমতা যদি রচনার চূড়ান্ত পরিচয় হয় তবে সংগীতকে বরণ করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গান যে সুষ্ঠু ভাষা, কিংবা বাউল, ঠুংরী, কীর্তন, ভাটিয়াল বা প্রচলিত রাগিণীর পরিচয়ের দ্বারাই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে তা নয়, সে-সব গানের সুরের ব্যঞ্জনা, কথা ও সুরের সংযম, কথার দ্বারা সুরের ও সুরের দ্বারা কথাগত ভাবের প্রকাশ যথার্থ হয় বলেই আমরা আনন্দ পাই। এই-সব গানে কোন্‌টি কাকে ব্যক্ত করছে বলা শক্ত, কোন্‌টি রূপ আর কোন্‌টি সত্তা ধরাই যায় না। অতএব সংগীত রসকে পৃথক ভাবাই উচিত মনে হয়।

এই সংগীত সম্বন্ধে আমার গোটাকয়েক বক্তব্য আছে। সুর ও কথা নামক প্রবন্ধে তার প্রকৃতি মিলনের শর্ত নির্ধারণের প্রয়াস

পেয়েছি। পুনরাবৃত্তির ভয়ে এখানে অন্য মন্তব্য করছি। সংগীত যখন দুয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৃতীয়ের সৃষ্টি, বহুব্রীহি সমাসের মতন, তখন বড়ো ওস্তাদও বড়ো কবি না হয়েও, কেবল 'সুরেলা' ও সাধারণ কবি হয়েও সংগীত রচনা সম্ভব। যেমন নিধুবাবুর টপ্পা, বিশেষত তাঁর 'যে যাতনা, অযতনে' গানটি। এক-এক সময়ে সন্দেহ হয় করিতকর্মা গায়কের পক্ষে উৎকৃষ্ট সংগীত রচনা যেন আরো বেশি শক্ত। সে যাই হোক— সংগীতের গায়ন পদ্ধতিই আমার বিচার্য, কারণ আমি শ্রোতা, অতএব শ্রোতার আনন্দ পাবার উপায় সম্বন্ধেই আমার বিচারের অধিকার আছে। আমার বিশ্বাস, দরবারী কানাড়ার ধ্রুপদ খেয়াল গাইতে যতটা রসজ্ঞান থাকা চাই, তার চেয়ে কোনো অংশে কম রসজ্ঞান থাকলে সংগীত গেয়ে প্রকৃত আনন্দ কেউই দিতে পারে না। এটা লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। সব সুরের খেলাই এই জগৎ থেকে দূরে নিয়ে যায়, রবীন্দ্রসংগীত ও তেলানা দুইই। দু প্রকার গানেই ধরা-বাঁধা নিয়মের বশবর্তী হয়ে বন্ধনকে অতিক্রম করতে হয়, তবেই মুক্তির আস্বাদ মেলে। রবীন্দ্রসংগীতের ভৈরবীও সুর, আবার ভৈরবীর তেলানাও সুর। শেষের ভৈরবী কে কবে বেঁধে দিয়েছে জানি না, অতএব সেটি নারদ ঠাকুরের দান ও অন্য ভৈরবীটি একজন জীবন্ত লোক রচনা করেছেন— অতএব হেয়, এই তফাত। কিন্তু দু প্রকার গানেই বিপদ রয়েছে, সাধারণ গায়কের পক্ষে। তেলানা গাইতে সুরকে অপমান করে ঐতিহ্যকে খাতির কিংবা কেরামতি দেখানোই যেমন রীতি হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রসংগীত গাইতে সুরের ধারা বদলে দিচ্ছি, নতুন সৃষ্টি করছি এই প্রকার আত্মসচেতনতা গায়কের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠতে দেখছি। সেইজন্যই বলি সংগীতের সম্মান দেখানো যার তার সাধ্য নয়। বড়ো কঠিন, বড়ো দায়িত্বপূর্ণ এই কাজ।

একটি কথা সর্বপ্রথমে সংগীত-গায়কের সর্বদা মনে রাখা চাই।

সংগীতে সংযমের অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন। যেখানে-সেখানে তান সংগীতে অচল। হিন্দুস্থানী গায়ন পদ্ধতিতেও অবশ্য তাই; কিন্তু অভ্যাসের দোষে তানবর্ষণকে যেন আমরা মাপ করতে শিখেছি। সংগীতে অযথা তান অক্ষমনীয়। যেকালে সংগীতস্রষ্টার মনে সুর ও কথা একত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন যমজ সন্তান দুটিকে বিচ্ছিন্ন করলে প্রত্যেককেই কষ্ট দেওয়া হয়। যমজের একটির অসুখ করলে অন্যটিরও হয় সকলেই জানে। সংগীতকার যেকালে কবিতা ও সুর, উভয়েরই স্রষ্টা, তখন সাধারণত, সংগীতের অনুপম ও অভিনব রসটি যে-কোনো সাধারণ গায়কের অপেক্ষা সংগীতকারের নিজের কাছে বেশি প্রকৃত ও পরিস্ফুট, এটুকু ভাবা অসংগত নয়। অবশ্য যদি কেউ সংগীতের মর্যাদা সংগীতকারের অপেক্ষা বাড়িয়ে দিতে পারেন তো বহুত আচ্ছা। সে আমাদেরই লাভ, কে না বেশি আনন্দ চায়? তবে মর্যাদা বেড়েছে কি কমেছে তার বিচারক হবেন সংগীতস্রষ্টা নিজে, কেননা কথা ও সুরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অপূর্বতা সম্বন্ধে তিনিই সব চেয়ে বেশি সচেতন, শ্রোতার চেয়ে, গায়কেরও চেয়ে।

অবশ্য মর্যাদা বাড়িয়েই দিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমাদের দেশে সংগীত রচয়িতার কবিতা ও সুরের উপর কোনো পেটেণ্ট নেই; অতএব সে কবিতাকে যে-কোনো ভদ্রলোক তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে ভরে খেয়াল-মাফিক গাইতে পারেন— আইনে বাধে না। একই কবিতার একই ইঙ্গিত হবে কেন? বরঞ্চ প্রত্যেকের কাছে যদি ইঙ্গিতে পৃথক হয় তবেই সেটি ভালো কবিতা হল। এপ্রকার তর্ক আমি শুনেছি। কিন্তু ভেবে দেখেছি, আপত্তিটা ঠিক খাটে না। ব্যাপারটা কবিতায় সুর বসানো নয়। ব্যাপার হল এই: সংগীতকে ভেঙে, তার কবিতাটিকে আলাদা করে তার উপর নিজের ইচ্ছামতো সুর বসিয়ে গাইলে সংগীত-রসের উদ্‌বোধন হয় কিনা। আমার মতে, কোনো একটি ফুলের শিশিতে পোরা নির্যাস

দিয়ে সেই ফুলের কিংবা অন্য ফুলের শুখনো পাতা গন্ধময় করে তোলা স্বাধীনচেতার চিহ্ন, কিন্তু রসজ্ঞতার নয়। এই রকম বোকামি আমি নিজে একবার করেছিলাম। অতুলপ্রসাদ একদিন 'সাথি, ওগো সাথি, আমি সেই পথে যাব সাথে' গানটি সদ্য রচনা করে গাইলেন। কবিতাটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছিল, কিন্তু কীর্তনের জন্য কিংবা অন্য কি কারণে আমার মনে নেই, সংগীতটি আমার তখন পছন্দ হল না। আমি তাঁর অনুমতি চাইলাম নিজের মতন করে গাইবার। তিনি অবশ্য হাসিমুখে তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। অনেক ভারী, হালকা সুর বসালাম বাড়ি এসে। হঠাৎ মনে হল, যাত্রার আসরে যুধিষ্ঠির সেজে নেমেছি। সেই থেকে আমার ধারণা হয়েছে সংগীতের হাড়মাস পৃথক করতে পারি, কিন্তু পুনরায় জোড়বার জাদুমন্ত্র আমার জানা নেই। অন্যের থাকতে পারে নিশ্চয়। যদি আমার দেওয়া সুরেই গাইতাম অতুলপ্রসাদ আমার নামে এক নম্বর রুজু করে দিতেন না। তবে, তাঁর বলবার অধিকার চিরকালই থাকত যে তিনি তাঁর সংগীতে যে-ভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন সেটি আমি ফোটাতে পারি নি। মোট কথা এই: সংগীতকারের রচনায় তাঁর অপেক্ষা শোভন সুর দিতে হলে গায়ককে একাধারে তাঁর অপেক্ষা বড়ো সুরসিক ও কাব্যরসিক হতে পারে— তা তিনি ছোটোই হন, আর বড়োই হন। বোধহয় তা হলেও চলবে না— যে শুভ মুহূর্তে ভাবগুচ্ছটি আপনা হতে সুরের রূপে বিকশিত হল সেইটি ফিরে পাওয়া চাই। আমি দেখেছি সংগীতকার নিজেই অনেক সময় তা পারেন না। ভাবের অদল-বদল হয়ে যায়, অতএব অন্যে পরে কা কথা! তবে রসের কথা বাদ দিলে গণ্ডগোল ঢুকে যায়। যতক্ষণ না পেটেন্টের আইনকানুন পরিবর্তিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমি যা তা করে গাইতে পারি— কেননা, রচয়িতাও মানুষ, আমিও মানুষ, অতএব আমায় রোখে কে! এ-মনোভাবকে

চিনি— আর্টিস্টের বলে নয় কিন্তু। সংগীতবিচারেও পলিটিক্স্ এসে পড়েছে।

অতএব আমার সিদ্ধান্ত মুক্তকণ্ঠে প্রচার করতে বাধা নেই। শার্গিদ যেমন নাড়া বেঁধে ওস্তাদের কাছে পাকা গানের প্রতি অক্ষর ও স্বর কণ্ঠস্থ করেন, ঠিক তেমনিটি করে বাংলা গানের শিক্ষার্থীকেও, মনোযোগ সহকারে, এক পর্দা এধার ওধার না করে, পান থেকে চুন না খসিয়ে সংগীতের গায়ন শিখতে হবে। বছর দশেক পরে হয়তো একদল সংগীতশিক্ষক উঠবেন, যাঁরা শিষ্যের ব্যক্তিত্বকে আগেকার ওস্তাদদের মতনই চেপে মেরে ফেলবেন। তখন অবশ্য বাংলা সংগীতের মুক্তির বাণী, আশার স্বপন, ডাইনীদের মতন আকাশে মিলিয়ে যাবে। আমার মতন লোকের পক্ষে কোনো কালেই মুক্তি নেই, আজ রহিম খাঁ, কাল লালিমা পাল (পুং)। তবে ওস্তাদের বদলে শিক্ষয়িত্রী এলে কি হয় বলা যায় না। সন্দেহ হয় খুব লাভ হবে না। মাছিমারা কেরানীতে পরিণত করবার ক্ষমতায় তাঁরা খাঁ সাহেব ও পণ্ডিতজীদের চেয়ে কম নন। কিন্তু সে তখন দেখা যাবে —আপাতত আমার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত আমার কাছে অত্যন্ত যুক্তি-সংগত মনে হচ্ছে।

পূর্বের প্যারা লিখেই মনে হল ঠাট্টা করে ফাঁকি দিলাম। সত্যই, এ-সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের স্থান কোথায়, কতটুকু? এক্স্প্রেসন বলতে কী বুঝি? মৌলিকত্ব কি কথার কথা? হিন্দুস্থানী ওস্তাদী গানে ও বাংলা সংগীতে গায়কের স্বাধীনতা কি ভিন্ন ধরনেরই? সাধারণত আমাদের ধারণা যে হিন্দুস্থানী গায়ন পদ্ধতিতে তান কর্তব, তালের বাটোয়ারা প্রভৃতি নানাপ্রকার অলংকারের ব্যবহার গায়ক ইচ্ছামতো করতে পারেন। দুটি স্থলে পারেন না, এক স্বর-যোজনায়, এবং ধ্রুপদে যেখানে নিয়ম একটু কড়া। তা ছাড়া, অবশিষ্ট স্থান সৃষ্টির লীলাভূমি। এ-ধারণা আংশিকভাবে সত্য।

একটি বিখ্যাত খেয়াল গান যদি দশবার শোনা যায় তবে অলংকারের পুনরাবৃত্তি ধরা পড়ে, এমন-কি তানের পর্যায়টি পর্যন্ত। কেবল তাই নয়, সব কাকেরই একই রা, প্রায়। ঘরোয়ানা অনুসারে অবশ্য অলংকার প্রয়োগের পার্থক্য আছে, এবং সত্যকারের প্রতিভার কথাও আলাদা। তবু ঠুংরি যে ঠুংরি, যেখানে ভাবের কতরকম ব্যাখ্যাই না চলে, তাতেও একঘেয়েমি থাকে। আমাদের ক্ল্যাসিকাল সুরপদ্ধতির অনেক বন্ধন। তাই যদি না হবে তবে ধ্রুপদের এই দশা কেন, এতরকমের টোড়ি, মল্লার, কানাড়ার কী প্রয়োজন? তেলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ প্রভৃতি কত ভঙ্গিই না আছে। রাগিণীর এত মিশ্রণ হল কেন? নিশ্চয় নিয়মের বিপক্ষে বিদ্রোহ করবার প্রবৃত্তি অহিংস ভারতবাসী ওস্তাদী মনেও ছিল, ও এখনও আছে।

তবু বলি, গায়কের স্বাধীনতা আছে, তার বৈশিষ্ট্যে। ব্যক্তিগত কামক্রোধ-রূপ মানসিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য নয় অবশ্য, কারণ স্বরে ও স্বরযোজনায় কোনো অন্তর্নিহিত সাহিত্যিক ভাব নেই আমরা জানি। কিন্তু অন্তর্নিহিত সাহিত্যিক ভাব না থাকলেও গায়কের মনের সাধারণ গতি, শিক্ষা, ভদ্রতা, অভদ্রতা গায়কের কণ্ঠে ধরা পড়ে, খুঁজে দেখলে। বাদকের বেলা ধরা আরো শক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এক টাঙাওয়ালা 'সাঁচি কহো মুসে বতিয়া' গাইতে গাইতে পাশ দিয়ে চলে গেল। তার মুখ দেখে মনে হয় সে কখনো অনুনয়, কখনো অভিমান করছে। সে সুরের নাম জানে না স্বর চেনে না, সে কেবল প্রিয়ার সঙ্গে সুরে কথা কইছে, প্রিয়া যেন তার আঁখির আগে আগে চলেছে। ভাবছি, কত দরদ, কী ফিলিং, কী এক্স্‌প্রেশন! আওয়াজ ঘন, শিরা ফোলা, চোখের জল যেন পড় পড়। ব্যাপারটা কি? টাঙাওয়ালা ব্যবহারিক জগতেই রয়েছে, ঘোড়াকে চাবুকও মারছে, সোওয়ারীর প্রতি নজর রাখছে, অবশ্য

অভ্যাসের বশে। টাঙাওয়ালা তার বিবির কাছে যেতে পারছে না, তাকে স্টেশনে যেতে হবে, টাকা রোজগার করতে হবে। জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে বলবে যে নিজের গৃহিণীর কাছে আর ফিরতে চায় না, মজনু হয়ে সে লয়লার কাছেই যেতে চায়। যাবার উপায় ঐ সংগীত। একটু পরে সে হঠাৎ তান ছাড়লে, আনন্দের লহর ছুটল, রাগ অভিমান উড়ে গেল, প্রিয়া অদৃশ্যা হলেন, রইল কেবল কল্পনার বিস্তার। এখানে কোনো উদ্দেশ্য, কোনো স্বার্থ, কোনো আত্মসচেতনতা রইল না, থাকল কেবল স্বরযোজনার রীতি, স্বর-বিকাশের নীতি, সামঞ্জস্য, অর্থাৎ ওজন জ্ঞান। টাঙাওয়ালা ওস্তাদ নয়, তাই রীতি-নীতি সম্বন্ধে অচেতন। এই কল্পনার রাজ্যে ইতিহাস নেই, সাহিত্য নেই, বিশেষ কোনো আবেদন নেই, স্বার্থের কুসন্ধি, ব্যাকুলতা পর্যন্তও নেই। এ রাজ্য ব্যবহারিক জগৎ হতে বহুদূরে অবস্থিত। সব আর্টিস্টই ব্যবহারিক জগৎকে সুইমিং বোর্ডের মতন ব্যবহার করেন, তবে গায়ক পরীর মতন ভিন্নলোকে প্রবেশ করেন, ও সাহিত্যিক খানিকটা লাফিয়ে জলে পড়েন, কেউ কেউ সাঁতার কাটেন, আবার যাঁরা সাঁতারু নন, তাঁদের দেহটাকে বাস্তব-পন্থী কুমির কিংবা আদর্শপন্থী শকুনিরা টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে। সুরের জগতে গায়ক ব্যবহারিক জীব মোটেই নয়।

তবে মৌলিকত্ব কি মাত্র সংগীত-রচনায় কিংবা তানের বেলাই কেবল? আমার আন্তরিক বিশ্বাস, সুরের ক্ষেত্র, যেখানে নিয়মের অত্যন্ত কড়াকড়ি সেখানে গায়কের স্বাধীনতা ধ্বনির ওজনে। এই ওজন দেওয়া যে কত শক্ত, দিতে পারলে যে কত মজা হয় তা খুব বড়ো আর্টিস্টের কাছে কিছুদিন ধরে না শুনলে বোঝা যায় না। হারমোনিয়মের সাহায্যে গাইলে ওজন দেবার প্রবৃত্তিটাও চলে যায়, গায়ক যদিও দিতে চেষ্টা করেন তবু ধরা পড়ে না, এবং অনভ্যাসের ফলে তার অস্তিত্বে শ্রোতার মনে অবিশ্বাসই জন্মায়।

সেইজন্যই হারমোনিয়ম মৌলিকতার প্রধান শত্রু। লোকে যাকে কোমল ধৈবত বলে সেটি অনেক সুরেই লাগে, সকালের, সন্ধ্যার, আবার গভীর রাতের, কিন্তু প্রত্যেক সুরেই কোমল ধৈবতের ধ্বনি-ব্যঞ্জনা আলাদা। কেবল কোমল ধৈবত গাইলে আমরা অবশ্য কোন্‌টি ভৈঁরোর, কোন্‌টি পূরিয়া-ধানশ্রীর আর কোন্‌টি মালকোষের চিনতে পারব না, কিন্তু সত্যকারের আর্টিস্ট যখন যে-সুরে কোমল ধৈবতটি লাগান তখন মনে হয় রাগটি এতই চমৎকার ফুটে উঠল যে অন্য যে-কোনো সুরের কোমল ধৈবত থেকে এটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই পার্থক্যের সুস্পষ্ট আভাস ও তার সাহায্যে রাগিণীর রূপ প্রকাশ করাই গায়ক-আর্টিস্টের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি ও মৌলিকত্ব। স্বর ও স্বরবিন্যাসের প্রতি দরদই প্রধান কথা, ইংরেজিতে যাকে feeling for the medium বলে। আনুষঙ্গিক অন্য কাজও আছে অবশ্য। আজকাল দরদ কথাটি খুব সচল, বিশেষত আসরে মহিলা আবির্ভাবের পর থেকে এত দরদ দেখেছি যে গা ঘিন ঘিন করে উঠেছে। দরদ মানে ভাবপ্রবণতা নয়। দরদ অর্থে ভালোবাসা মেশানো শ্রদ্ধা। মা যদি ছেলেকে কেবলি ভালোবাসেন তবে সে-ছেলে মানুষ হয় না, মা'র ছেলেকে শ্রদ্ধা করাও চাই, অর্থাৎ ছেলের পৃথক সত্তাকে গ্রাহ্য করে তার অর্বাচীনতার ক্ষতিপূরণের জন্য তার সহ-অনুভূতি চাই। ভালোবাসলে এই সহ-অনুভূতিটা আসে, তাই ভালোবাসার এত নাম-ডাক, নচেৎ মাথাখাবার খিদে বাড়াবার জন্য ভালোবাসার মতো অমন জোরাল হজমীগুলি আর নেই। দুর্ভাগ্যের কথা, সংগীত-গায়ক ও বিশেষত গায়িকারা কেবল ভালোবাসতেই জানেন। সেইজন্য শ্রদ্ধা, অর্থাৎ সংযমের উপর অত জোর দিচ্ছি। প্রকৃত দরদের জন্য নিয়ম মানতে হবে, তবেই, ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, নিয়মকে অতিক্রম করা যাবে। এইপ্রকার নিয়মাধীনতা ও সন্তর্পণতা ভিন্ন রাগিণীর ও সংগীতের রূপ ফোটে না,

মৌলিকত্ব তো দূরের কথা। বলা বাহুল্য, আমি ওস্তাদী শুচিবাই-গ্রস্ততার উল্লেখ করছি না। সত্যকারের আর্টিস্ট রাগিণীতে বিবাদী স্বর পর্যন্ত লাগান, তাতে রাগভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু কখন? রূপ ফোটাবার পরে। বিবাদী স্বরকে শক্র বলা হয়, আর বাদী স্বরকে রাজা। রাজার কাজ শক্র জয় ক'রে নিজের শৌর্য বীর্য প্রকাশ করা। কিন্তু আগে ছোটো রাজত্বটাই প্রতিষ্ঠিত হোক, তার পর শক্র জয় ক'রে রাজার ব্যক্তিত্ব, মৌলিকত্ব প্রভৃতি দেখাবার সুযোগ হবে। আমার বক্তব্য যদি ধ্রুবপদ্ধতির বেলা সত্য হয়, তবে সংগীতের বেলা আরো সত্য, কারণ সেখানে কথার অতিরিক্ত বাঁধন রয়েছে, এবং সেই বাঁধনের সঙ্গে সুরের বাঁধনের ফাঁস লাগিয়ে দুটোকেই কাটতে হবে, তবেই সংগীত-গায়ক মৌলিক, স্বাধীন, মুক্ত হবেন। সংগীতের নিয়ম আরো কড়া। দুঃখ এই, লোকে ভাবে অতি সোজা।

সকলে সংগীত স্রষ্টা নন— রবি ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল হওয়া একটু কঠিন, তাই সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে মৌলিকত্ব, ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে হলে, তার সুচারু প্রকাশ করতে গেলে যাতে ওজন-জ্ঞানটি বৃদ্ধি পায় তার চেষ্টাই প্রাথমিক কর্তব্য। তার উপায় স্বর-সাধন, ভালো গায়কের গান শোনা, স্বর-বিন্যাস শেখা। তার পরও কর্তব্য রয়েছে— সেটি বিচার, অর্থাৎ রসানুভূতিকে বাঁচানো ও বৃদ্ধি করা। গলা ও মূল্যজ্ঞান যদি ওস্তাদ ও পণ্ডিতের মতামত থেকে রক্ষা করতে কেউ পারে, তবে বাকিটা সহজ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রচয়িতার সংগীত একটু মন দিয়ে শিখতে হবে, হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীরই মতন, এই ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করি— কেননা, আজকের রোমান্টিক সংগীত আগামীকালের ক্ল্যাসিক্যাল সুরপদ্ধতি। এবং আগামীকাল আসেই আসে।

লেখাটি শেষ করে নিজেরই হাসি পাচ্ছে। সকলেই জানেন,

আমিও জানি যে আমার গান শেখা হল না। না-শেখার কারণ পরকে উপদেশ দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ল। আমার দ্বারা কোনো কৃচ্ছ্রসাধনই সম্ভব নয়— না ওর বানান, না ওর উচ্চারণ। কোথায় তর্কের জগৎ আর কোথায় রাগের জগৎ ? প্রলুব্ধ মধুকরকে কৃতী গণ্য করে দুষ্মন্ত মহারাজ তত্ত্বান্বেষীকে যথার্থই উপহাস করেছিলেন।

মহারাজ তা করুন গে! আমি দেখছি, বুঝেসুঝে গান শুনলে আনন্দ বাড়ে বই কমে না। শোনবার সময় বুদ্ধিটা লুকিয়ে রাখতে হয়, তাকে মেরে ফেলতে নেই। ভালো কথা— সংগীত-গায়কবৃন্দ একটু-আধটু ধ্রুপদ খেয়াল শিখুন-না। আর গায়িকারা— তাঁদের যেন শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ হয়, ঘর সংসার ভরে যায়।

রবীন্দ্র-সংগীত

আমার বিষয় হচ্ছে হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসে রবীন্দ্র-সংগীতের স্থান কোথায় ও কতটুকু। গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো যে আমি দুটি শ্রেণীর ভদ্রলোকদের জন্য কিছু বলছি না। এক শ্রেণী হচ্ছে ওস্তাদের; কেননা যত সত্যকারের বড়ো ওস্তাদের সঙ্গে আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি ততই দেখেছি যে তাঁরা রবীন্দ্র-সংগীত সত্যই ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে— ছোটো ওস্তাদদের এবং তথাকথিত উচ্চসংগীতপ্রিয়দের; এঁদের গোঁড়ামি দেখে আমি হতাশ হয়েছি। বড়ো ওস্তাদদের নতুন কথা শোনাবার ধৃষ্টতা নেই, এবং অন্যদের নিজমতে আনবার বাসনাও নেই, শক্তিও নেই। আজ আমি শুধু তাঁদেরই সঙ্গে কথা কইব যাঁরা কোন্ সংগীত উঁচু আর কোন্‌টি নিচু না ভেবে সব রকমেরই সংগীত থেকে সহজ আনন্দ উপভোগ করেন, যাঁরা রবিবাবুর গানের মধ্যে প্রাণের অনেক গোপন কথার আভাস পান— এক কথায় যাঁদের মন ধার-করা মতের বাণ্ডিল হয়ে ওঠে নি। আশা করি তাঁরাই আজকের শ্রোতা। আমার বিশ্বাস— আমাদের দলেরই সংখ্যা বেশি, এবং কণ্ঠে হোক আর না হোক, আমাদেরই পোষকতার ওপর সংগীতের প্রসার ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমাদের মধ্যে সংগীত-শিক্ষার অভাব দুঃখের বিষয়, কিন্তু পূর্বার্জিত কুসংস্কার থেকে মুক্তিও কম লাভ নয়।

হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতিতে দুটি ধারা লক্ষ্য করতে হবে। এক দরবারী সংগীত, অন্যটি লোকসংগীত। কেবলমাত্র দরবারী সংগীতকেই হিন্দুস্থানী সংগীত ভাবলে সংগীতকে অবমাননা করা হয়। হিমালয় শুধু গৌরীশৃঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও নন্দা পর্বত নয়। কোনো

সংগীত একটি মাত্র শ্রেণী কি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। যদি থাকে তা হলে হয়তো তার কোনো-এক দিকের বিশেষ উন্নতি সম্ভব হয়— কিন্তু সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির জন্য দরবারের বাইরে সর্ব-সাধারণের মিলনক্ষেত্র খোলা মাঠঘাটের জীবনসঞ্চারক মুক্তির একান্ত প্রয়োজন। যাকে আমরা এখন দরবারী সংগীত বলি তার চরম বিকাশ— ধ্রুপদ, আগ্রা গোয়ালিয়র অঞ্চলের দেশী লোকসংগীত ছিল ; পরে নানা কারণে দরবারে প্রবেশলাভ করে। হয়তো আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে আকবর বাদশার দরবারে ধ্রুপদ গাওয়া হত বলে একজন ঐতিহাসিক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। আকবর বাদশার যুগের পূর্বে ধ্রুপদ কোন্ দেবদেবীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল আমাদের সঠিক জানা নেই। সে সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস বিস্তর, কিন্তু প্রমাণ স্বল্প। যতটুকু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছি তার থেকে মনে হয় যে একটা অঞ্চলের সংকীর্ণ দেশী স্বরপদ্ধতি দরবারী সংগীত হয়ে উঠেছিল। আমরা সকলে ধ্রুপদকে শাস্ত্রোক্ত মার্গসংগীত বলে ভুল করি। ধ্রুপদ যে মার্গসংগীত নয় তার একটি প্রমাণ এই যে মার্গসংগীতের ঠাট মুসলমান যুগের কিছু পূর্বেও ছিল কনকাঙ্গী— যার পরিচয় খানিকটা পাওয়া যায় দক্ষিণী সংগীতে। সকলেই জানেন যে বর্তমান পদ্ধতির ঠাট শুদ্ধ বেলাওলের। শাস্ত্রোক্ত শুদ্ধ গান্ধার এখনকার প্রায় কোমল গান্ধার, অর্থাৎ এখনকার কাফি ঠাট আগেকারের শুদ্ধ সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা। অবশ্য পুরোপুরি নয়, কেননা শ্রুতি সম্বন্ধে ধারণা অনেক বদলেছে। অর্থাৎ, এখন মার্গসংগীত গাইতে হলে ধ্রুপদ গাওয়া অন্যায় হবে। দক্ষিণী গায়কী চালে ধ্রুপদ গাওয়া হোক্, এ কথা ধ্রুপদের অতিবড়ো ভক্তরাও বলবেন না। মোদ্দা কথা এই যে মান তানোয়ারের পূর্বেই অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝেই ভক্তিরসের বন্যায় মার্গসংগীত কোথায় ভেসে চলে যায়। সেই বন্যার জলকে রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে আনলেন

কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি— মান তানোয়ার, আদিল শা', আকবর এবং তাঁদের দরবারের সম্ভ্রান্ত ওস্তাদরা। তার পরে সেই রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে পবিত্র পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করলেন পুরোহিত পণ্ডিতদের দল। অনেক শাস্ত্র, টিকাটিপ্পনী লেখা হল। উদ্দেশ্য নিতান্ত সাধু— বাদশা, রাজ-রাজোয়াড়ার পছন্দকে দুর্বোধ্য ভাষার সাহায্যে শাস্ত্রের কোঠায় তোলা— এ তো পণ্ডিতদের সনাতন ব্যবসা! তাঁদের উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধিলাভ করেছে তার প্রমাণ হচ্ছে ধ্রুপদ সম্বন্ধে ভুল ধারণা, এবং যে পদ্ধতি দরবারী সংগীত পদ্ধতি থেকে একটুও পৃথক, তাকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অবজ্ঞা করা। আমি ধ্রুপদের অন্ধভক্ত, সব গানের চেয়ে আমার ধ্রুপদই ভালো লাগে, কিন্তু আমি জানি ও আপনাদের জানাতে চাই যে আজ-কালকার ধ্রুপদ চার-পাঁচশো বছর পূর্বে সংকীর্ণ, দেশী, লোকসংগীতই ছিল। অতএব তার নাম নিয়ে অন্য একটি দেশী সুর-পদ্ধতির মিশ্রণকে অশাস্ত্রীয় বলবার ঐতিহাসিক অধিকার আমাদের নেই। এই সংকীর্ণ সুর-পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান সংকীর্ণ সুর-পদ্ধতির পার্থক্য শুধু এই— একটি গোয়ালিয়রের, অন্যটি বাংলার, পার্থক্য শুধু মুসলমান বাদশার সংগীতপ্রিয়তায়, আর ইংরেজ রাজার রুচির অভাবে, পার্থক্য শুধু তানসেন, ধোঁন্দি, সরযূর কৃতিত্বে আর নাকীসুরের মনভোলানো ন্যাকামিতে। কিন্তু রচয়িতার সৃষ্টির অধিকারে কোনো পার্থক্য নেই।

ব্যাপারটা এই— কৃষ্টি অর্থাৎ কাল্‌চারের ক্ষেত্রে আভিজাত্যের এমন-কি কৌলীন্যের বিশেষ প্রয়োজন সর্বদাই রয়েছে। একটা-না-একটা পরিমাণ না থাকলে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু এও ঠিক যে কুলীনে কুলীনে বিবাহ ও আদান-প্রদান হতে হতে আভিজাত্যের বীজটি নষ্ট হয়ে যায়। একটা নদী সেই আদিম প্রস্রবণের স্রোতের জোরেই খুব দূরের সমুদ্রে মিশতে পারে না। উপনদীর জল, মাঠের

জল, খালবিলের জল এসে নদীতে মেশা চাই, না হলে নদী আপনা হতেই মজে যায়। এটি শুধু উপমা নয়, সত্য কথা। হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাসেও তাই দেখি। যে খেয়ালকে উচ্চসংগীত বলা হয়, তার সম্বন্ধে দুটি মত আছে। একটি মত, খেয়াল আমীর খসরুর সৃষ্টি, আলাউদ্দীন খিলজীর সময়; অন্য মত হচ্ছে যে, এটি জৌনপুরী চাল, প্রথম প্রচলিত হয় সির্কিদের সময়। অবশ্য মহম্মদ শা' রঙ্গীলের সময়ে সদারঙ্গ ও অধারঙ্গের দৌলতেই খেয়াল রাজদরবারে হাজির হয় এবং ধ্রুপদের মতনই দরবারের পোষকতায় প্রচারলাভ করে। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় যে দরবারী হিন্দুস্থানী সংগীত শুধু কৌলীন্য করেই তার আভিজাত্য বজায় রাখে নি। প্রাদেশিক সুরপদ্ধতিও অনেক সময় গৃহীত হয়েছে। শুধু পদ্ধতি নয়, প্রাদেশিক সুরও নেওয়া হয়েছে। প্রমাণ, রাগিণীর নামেই পাওয়া যায়, যেমন বাঙালী, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্রী, গুর্জরী। আবার কোনো বড়ো ওস্তাদ একটি রাগিণীকে নিজের মতো করে গেয়েছিলেন, লোকের ভালো লেগেছিল, এখনও সেই ভঙ্গিতে রাগিণীটি গাওয়া হচ্ছে; ওস্তাদরা শুদ্ধ টোড়ী, শুদ্ধ মল্লার, শুদ্ধ কানাড়া গেয়ে তৃপ্ত হন না, তাঁদের কৃতিত্ব দেখাতে গিয়ে বিলাসখানী টোড়ী, মিঞাকী মল্লার, ধোঁন্দি মল্লার, সুরদাসী মল্লার, হোসেনী কানাড়া গাইতে হয়। একই সুর বসন্ত এক প্রদেশে পঞ্চম দিয়ে, অন্য প্রদেশে পঞ্চম বর্জিত করে গাওয়া হয়, এবং দু' চালের বসন্তেই ধ্রুপদ শোনা গেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে একই তালের মাত্রা ও বোল ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন, অথচ প্রত্যেক রূপই ওস্তাদরা সংগত বিবেচনা করেন। দেশী সুরের ইতিহাস আমরা ভালো করে জানি না। তবে এইটুকু বোধহয় বলা যায় যে দেশী অর্থাৎ লোকসংগীতও তার কৌলীন্য বজায় রাখতে পারে নি। যাত্রাও অপেরা হয়েছে।

অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আমাদের দেশের সুরপদ্ধতি

বদলেছে, সেটি অচলায়তন নয়, তার গতি আছে, সেটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। সেটি একেবারে জুপিটারের মাথা থেকে মিনার্ভা দেবীর মতন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে জন্মায় নি। যাঁরা ভাবেন যে বছরও চলছে, আর সবেরই অবনতি হচ্ছে, তাঁরা হয়তো প্লেটো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শিষ্য হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা হিন্দুস্থানী সংগীতকে অপমান করেন জোর করে বলতে পারি। কেননা আমাদের সংগীত, দরবারী ও দেশী, দুটি ধারাই এখনও চলছে, এখনও জীবিত। আমি আশা করি যে তার জীবন্মৃত অবস্থা জ্ঞানের ক্ষণিক লোপ মাত্র। এই হল সংগীত-ইতিহাসের শিক্ষা— এবং সে শিক্ষাকে গ্রহণ করতেই হবে। না করলে নিস্তার নেই, কেননা মাটির প্রতিহিংসা, জীবনের প্রতিহিংসা, ইতিহাসের প্রতিহিংসা ভীষণ, দুর্নিবার।

এখন দেখা যাক যে রবীন্দ্রনাথের সংগীত আমাদের সংগীতের ইতিহাসকে খাতির করেছে কিনা— তাঁর সংগীতে জীবনের পরিচয় আছে কিনা, তাঁর সংগীতের অভিব্যক্তি আছে কিনা। তার পর দেখতে হবে যে হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতি থেকে তাঁর গানের পদ্ধতি কতটা পৃথক, অর্থাৎ তাঁর রচনার বিশেষত্ব কী। আমার সময় কম তাই মাত্র এই তিনটি বিষয়ের আংশিক আলোচনা সম্ভব হবে। ইতিহাসের অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে স্ববশে আনবার তাঁর প্রয়াস এবং নিজের সংগীতের ক্রমবিকাশ অনেক সময় একই ধারায় চলেছে। এটি জীবনধর্মেরই রীতি; সমগ্র জাতির অভিব্যক্তি ব্যক্তির জীবনে ক্রমিক পরিণতি লাভ করে। মোটামুটি হিসাবে ব্যক্তির জীবনকে তার শ্রেণীর ইতিহাসের ছোটো সংস্করণ বলা যেতে পারে। অতএব রবীন্দ্রনাথের সংগীতের ক্রমবিকাশটি বুঝলেই তিনি সমগ্র হিন্দুস্থানী সংগীতের বিকাশধারাকে কতটুকু বরণ করেছেন বুঝতে পারব।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতে তিন-চারটি স্তর আছে। প্রথম যুগে

কিংবা স্তরে তিনি ভালো ভালো খানদানী 'ঘরোয়ানা চীজের' সুরকে আশ্রয় করে গান রচনা করেছেন। যদু ভট্ট ও রাধিকা গোস্বামী, এবং সেই সময়কার বড়ো বড়ো ওস্তাদের মুখে তিনি খুব ভালো চালের ধ্রুপদ ও খেয়াল শুনতেন— তাঁর সেজদাদা জ্যোতিবাবু এই সুর নিয়ে পরীক্ষা করতেন, সেই সুরে রবীন্দ্রনাথকে গানের কবিতা লিখতে বলতেন। এই যুগে তাঁর গান শুদ্ধ, তানে মানে, লয়ে, সে গানের চাল অধিকাংশই ধ্রুপদ, ধামার, সাদ্‌রা অর্থাৎ ঝম্পের; ধ্রুপদের চারটি পদ, মীড়, মূর্ছনা সবই তাঁর এই যুগের গানে আছে। গানের বিষয়গুলিও গুরুগম্ভীর।

দ্বিতীয় যুগে তিনি সেই খানদানী কাঠামোর ভেতরেই একটু সুরের ও তালের নতুনত্ব করছেন। কাঠামোটি সেই পুরাতন, কিন্তু কিসের একটা প্রয়োজন, কিসের একটা তাগিদ তিনি পূরণ করতে পারছেন না, তাই কাঠামোর ওপর রঙটি বদ্‌লাতে হচ্ছে, তার ওপর অলংকারগুলিকে একটু নতুন রকমে সাজাতে হচ্ছে। এ প্রয়োজনটি কিসের? আমার মতে এ প্রয়োজন একটি বিশেষ mood-এর, ভাবের, খেয়ালের। ওস্তাদের মুখে যখন মল্লারের বিশেষ association-গুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে, অথচ বৃষ্টিধারার বিরাম নেই, মেঘ আপন খেয়ালে নিরুদ্দেশে যাত্রা করছে, প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে, তখন মল্লারের আশ্রিত স্মৃতিগুলিকে রূপ দিতে হলে রাগিণীকে ওস্তাদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে, তাকে মনোভাবের উপযোগী করবার জন্য কিছু অদলবদল করতে হবে। সেই জন্যই মল্লারে দুটো নিখাদ উপরি উপরি না দিয়ে গানের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় যুগে এক কারণেই 'সুরভ্রষ্ট' হয়েছেন।

বাস্তবিক পক্ষে, সুর মনের একটি ভাষা, ভাষা ভাবকে প্রকাশ করে, অবশ্য যা তা ভাবকে নয়। ভাব কিছু একই ধারায় চলে না, তার বৈচিত্র্য আছে, বর্ষার সময় কারুর ছোলাভাজা খেতে ইচ্ছে

করে, কারুর মেঘদূত পড়তে ইচ্ছে করে, কারুর বা গান শুনতে ইচ্ছে হয়। মানুষের মনের গতি মোটামুটি এক হলেও প্রত্যেক মানুষের, বিশেষ করে, প্রত্যেক আর্টিস্টের খেয়াল বিভিন্ন। এই বিশিষ্ট মনোভাবের দাবি হিন্দুস্থানী সুরের ওস্তাদের মুখে পূরণ হয় না। আমাদের ধারণা ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীতে পরিণত হল, প্রত্যেক রাগিণী আবার ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত হল। এটা ঠিক ঐভাবে হয়েছে কিনা জানি না, তবে আমাদের সংগীতে প্রত্যেক রাগিণীর নানান রূপ আছে। এই বৈচিত্র্যের তাৎপর্য কী? তাৎপর্য এই, মানুষই যখন গান গেয়ে থাকে, যখন মানুষ নিয়েই কারবার, তখন তার মনোভাবের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করতেই হবে। অতএব হিন্দুস্থানী সুরের কাঠামোকে অদলবদল করবার প্রয়োজনীয়তা আছে, মানবমনের বৈচিত্র্যকে রূপ দেবার অধিকার আছে, যে অধিকার অষ্টাদশ কানাড়ার অস্তিত্বে বিশ্বাসের মধ্যে গুপ্ত রয়েছে। এই কারণেই, এই বিশ্বাসের জোরেই রবীন্দ্র-সংগীতকে বিচার করা ঐতিহাসিক সমীচীনতা।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে নতুনত্বটুকুর মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ আছে কিনা। গানে অনেক ধরনের গুরুচণ্ডালী দোষ ওঠে। স্বরের দিক থেকে বিবাদী স্বরকে বাদী করা, গতির দিক থেকে আরোহীর নিয়মকে রক্ষা না করা, ভাবের দিক থেকে গুরুগম্ভীর ভাবকে হালকা সুরে ব্যক্ত করা, তালের দিক থেকে ভারী সুরকে হালকা তালে বসানো প্রভৃতি নানারকমের গর্হিত আচরণ সম্ভব হয়। এক কথায় বলতে গেলে রীতিবিরুদ্ধ কাজ করার নামই গুরুচণ্ডালী। কিন্তু সামান্য অদলবদল করবার অধিকার শাস্ত্রেই দিয়েছে, বিবাদী স্বরকে দেখানোর রীতিও আছে। একটা শ্লোকে আছে বাদী রাজা, ও বিবাদী শত্রু। রাজা যেমন তাঁর প্রজাকে ক্ষমতা দেখাবার জন্য শত্রুকে কয়েদ করেন, তেমনি গায়ক তাঁর কৃতিত্ব দেখাবার জন্য

বিবাদী স্বরকে ব্যবহার করতে পারেন। বরোদার দরবারী গাইয়ে ফৈয়াজ খাঁ এবং আবুল করিমের মুখে ও কেরামত খাঁর হাতে মালকোষ-এ পঞ্চম লাগিয়ে গাইতে বাজাতে শুনেছি, তাতে মালকোষের সাধারণ মনোময় রূপটি নষ্ট হয় নি। তবে আর্টের ক্ষেত্রে অন্তত জেনেশুনে পাপ করলে সেটি পাপ থাকে না এই যা। আসল কথা হচ্ছে রূপটি রক্ষা করতে হবে, এবং সে রূপটি নিতান্তই অভ্যাসের ক্রীতদাস। অতএব অভ্যস্ত পদ্ধতিকে অত্যাচার না করে নতুন রসের সৃষ্টি করার অধিকার যুক্তিসংগত। মানুষ বৈচিত্র্যের উপাসক — তাই বলে অবশ্য নতুনত্বের মোহে চরিত্র নষ্ট করতে কিংবা উৎসন্ন যেতে বলা যায় না। কিন্তু যদি কোনো মধ্যবয়সী ভদ্রলোক অফিস থেকে তেতেপুড়ে এসে তাঁর গৃহিণীকে অনুরোধ করেন, 'ওগো, একটু ঘোমটা দিয়ে, নতুন শাড়ী পরে বসো, একটু পরস্ত্রী বলে মনে হোক'— তা হলে তাঁর প্রতি অনুকম্পাই হয়, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ব্যাপার হচ্ছে, opposition within the constitution হলেই সংগত হয়। রবীন্দ্র-সংগীতের দ্বিতীয় স্তরে এই জিনিসটি রয়েছে, সেইজন্য এই যুগের গান অনেক ওস্তাদও গেয়ে থাকেন।

এই যুগেই তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন, তা হলে তাঁকে শুধু একজন উচ্চস্তরের নিধুবাবু কিংবা যাত্রাগানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলতাম। কিন্তু এই দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে তিনি এক নতুন পরীক্ষা করলেন। শুধু এক সুরের সঙ্গে সেই জাতেরই অন্য সুর মিশিয়ে তিনি সুখী হলেন না, সৃষ্টির এক নতুন উৎসের সন্ধান পেলেন। সে উৎস অতি নিকটেই ছিল, একেবারে হাতের কাছে, দ্বারের পাশে, পল্লীগ্রামে। কবি চিরকালই পল্লীজীবনের ভক্ত, শহরের কৃত্রিমতা তাঁর কখনও ভালো লাগে না। তাঁর জীবনের বোধহয় সবচেয়ে সুখের সময় ছিল যখন তিনি পদ্মার দুধারের গ্রামের ঘাটে নৌকা ভেড়াতেন। মাঠে ঘাটে, নদীর ধারে, তিনি বৈরাগীর বাউল ভাটিয়াল, মাঝিদের সারি গান,

পল্লী-উৎসবের ঐক্যসংগীত শুনে বেড়াতেন— তাঁর প্রাণে ঐপ্রকার গানের সুরের আবেগ, ভাবের সরল স্বাধীনতা ও গভীরতা সাড়া দিত। নিতান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মতো তিনি এই পল্লীসংগীত, এই লোকসংগীতের মর্ম গ্রহণ করলেন। এইখানেই তাঁর প্রতিভা। জীবনের সমগ্র ধারাকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে বহমান করানো প্রতিভার কাজ।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে হিন্দুস্থানী দরবারী সংগীত এতদিন যে বেঁচে এসেছে তার অন্যতম কারণ এই যে তার ক্রাইসিস-এর সময় লোকসংগীতের রক্ত তার শিরার মধ্যে ইনজেক্ট্ করানো হয়েছিল। (কোন্ ডাক্তার এ কাজ করে আমাদের জানা নেই, তবে এ পন্থায় যে সে এখনও বেঁচে রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওস্তাদদের ব্যক্তিগত দানও কম নয়।) সেইজন্য রবিবাবুর গানের তৃতীয় স্তরে ভাটিয়াল, বাউলের আগমন লক্ষ্য করি। এই যুগের গানে দরবারী সুরপদ্ধতির সঙ্গে ভাটিয়াল বাউলের মিশ্রণ হয়েছে। সুরগুলিতে আমাদের কান অভ্যস্ত নয়, সেইজন্য এইযুগের গান শুনে আমরা বলি 'এটা না হল কেদারা, না হল বাউল, হল একটা খিচুড়ি।' আমার বক্তব্য এই, পোলাও খুব ভালো জিনিস, তবে খিচুড়ি রাঁধতে পারলে মন্দ হয় না। বর্ষাকালে কি শীতকালে খিচুড়ি খুবই উপভোগ্য খাদ্য। খিচুড়ি হিন্দু বিধবারা খান না, কিন্তু যত্নসহকারে রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দেন— জগন্নাথ অন্য খাবার পছন্দই করেন না। আসল কথা, রান্নাটি ভালো হওয়া চাই। শুধু খানিকটা ঘি, তেজপাতা, ছোটো এলাচ, জাফরান, আখনির জল দেরাদুন চালের ওপর ঢেলে দিলেই যে পোলাও চমৎকার হয়ে ওঠে স্বীকার করতে নারাজ।

এর পরের যুগ এখনও চলছে। ঘোড়া উইনিং-পোস্ট-এর কাছে এসেছে, তার স্ন্যাপশট্ তুলে দিতে রাজি নই— কারণ যে ঘোড়া

ছুটছে তার সৌন্দর্য ছবিতে ওঠে না, যখন ঘোড়া আস্তাবলে যাবে তখনই তার ছবি তোলবার সময় হবে— এখনও হয় নি। .শুধু এইটুকু বলি, এই যুগের গানই তাঁর গানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি— তা আমাদের আগেকার গানের মতো ভালো লাগুক আর না লাগুক— এর কথাগুলি হয়তো গীতাঞ্জলির কথার মতন নয়, তবু এর মধ্যে এমন একটি সংযম আছে, কথা ও সুরের মধ্যে এমন একটি মিল আছে, তার সৌষ্ঠব এত হৃদয়গ্রাহী, তার আবেদন একসঙ্গে এত personal ও impersonal, যে তার থেকে আনন্দ না পেয়ে থাকা যায় না। লোকসংগীতের গ্রাম্যতা, তার অসংযত আবেগ ও চীৎকার যেমন এর মধ্যে নেই, তেমনি দরবারী সংগীতের অজস্র তানের ও তালের নিরর্থক গুণ্ডামিও এর মধ্যে নেই। অথচ তাদের সদ্‌গুণ সবই রয়েছে, আনন্দের সব উচ্চাঙ্গের উপাদানই রয়েছে, লোক-সংগীতের ভাবসম্পদ, এবং দরবারী সংগীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য ভদ্রতা ও শালীনতা। তবে এগুলি খাঁটি লোকসংগীত নয় মনে রাখাই ভালো।

রবিবাবুর গানের বৈশিষ্ট্য কী এবং কোথায়, তাঁর গানের থেকে হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতি কিভাবে পৃথক পূর্বে বলেছি। সেই কথাটির পুনরুল্লেখ করে আজ শেষ করি।

হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতি নিতান্তই impersonal, abstract; ব্যক্তির, গায়কের, শ্রোতার মনোভাবের সঙ্গে সে পদ্ধতির সম্বন্ধ মোটেই direct নয়, ছু থাক দূরে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে। বিরহ সর্বপ্রকার আর্টের বিষয় হতে পারে— তা নিয়ে ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, মূর্তি গড়া চলে। তবে প্রত্যেক আর্টের প্রকাশ-রীতি ও আঙ্গিক ভিন্ন বলে বিরহের সব সূক্ষ্ম মনোভাবগুলিই এক আর্টের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না, সেইজন্য উচিত নয়। একটু কর্মের বিভাগ দরকার হয়ে ওঠে। সুরও একটি প্রকাশের

ভাষা, অতএব বিরহের কোনো-একটি বিশেষ খেয়ালকে প্রকাশ করাই গানের সংগত বিষয়। এখন যদি আমি শুধু সার্গম গেয়ে যাই কিংবা আ-আ-আ করে করে তান তুলি তা হলে সেই বিশেষ সংগীতোপযোগী বিরহভাবের প্রকাশ সহজ হয় না। প্রকাশ হয় না, এ কথা মোটেই বলছি না, কেননা যন্ত্রের সাহায্যে অনেক ভাব ব্যক্ত করা যায়। আমি বলছি সহজে হয় না। সহজ হয় না বলেই যে সেটি খারাপ হল, তাও মানি না, কিন্তু আর্টের অন্তত একটি প্রধান কথা যখন ব্যক্ত করা, তখন ব্যক্ত করাটিকে সহজ করলে শ্রোতার আনন্দানুভূতির পথটি সুগম করা হল, শ্রোতার মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করা হল না, শ্রোতা মন দিয়ে সুরের বিচার করতে পারল। অতএব সহজে বিশেষ কোনো মনোভাবকে ব্যক্ত করা যদি কোনো আর্টের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সহজে বোধগম্য কোনো উপায়ের সাহায্য নিতে হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে এই উপায়টি— কথা। কথার সাহায্য নেওয়াতে বিপদ আছে, কেননা কথার মূল্য আলাদা, তার নিজের রীতি-নীতি, টেকনিক্ আলাদা। অতএব কথার সঙ্গে সুরের একটা বোঝাপড়া করা চাই। কথা যদি ভাবকে সাহায্য করে, তা হলে তাকে মিত্র বলে গ্রহণ করতেই হবে, কেননা এই মিত্র সংগীতের সম্পদবৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু কথা যখন স্বাধীন হয়ে উঠল, তখন তাকে বর্জন করতে হয়। সুরের সঙ্গে কথার সন্ধি-শর্তগুলি ভালো করে draft করা চাই, না হলে alliance ভেঙে যায়। আদত কথা মনের ঐক্য।

এখন হিন্দুস্থানী গানে একটি জিনিসের অভাব লক্ষ্য করেছি। সব গানের কথা বলছি না, বেশির ভাগ গানে সুরের সঙ্গে কথার সম্পর্ক মিত্রের হওয়া দূরে থাকুক শত্রুরও নয়। ফলে হিন্দুস্থানী গান যেখানে যন্ত্রসংগীত থেকে পৃথক সেখানে কোনো মনোভাবকেই ব্যক্ত করে না। অনেকে একেই হিন্দুস্থানী গানের বিশেষত্ব বলেন।

মনোভাবের সঙ্গে যদি সুরের সম্পর্ক নাই থাকে, তাতে আপত্তি নেই, তেলানা শুনেও প্রাণ খুশি হয়। কিন্তু ব্যাপার এই যে সব সময়ে হয় না। সেইজন্য তেলানা ও যন্ত্রসংগীত ছাড়া অর্থসংগীতের প্রয়োজন রয়েছে, তবে সুরকে যেন ভাবার্থটি ছাপিয়ে না যায়, তাকে সাহায্য করে, সমৃদ্ধ করে, তার ইঙ্গিত বহন করে এইটাই দেখতে হবে। প্রয়োজন স্বীকার করবার পর দেখতে হবে যে মনোভাবের কোনো বৈচিত্র্য আছে কিনা, দেখতে হবে যে মনোভাবটি একই রাগে গাওয়া হচ্ছে, না তার ছত্রিশ রাগিণীতে গাওয়া হচ্ছে। মনোভাব সাধারণের সম্পত্তি হলেও মানুষের মনের, সংস্কারের রঙিন কাচ দিয়ে আসার দরুন ভিন্ন হয়ে যায়। কানু বিনা গান নেই, এবং গৌড়সারং গাইতে হলেই 'পলন লাগে মোরে আঁখিয়া' গাইতে হবে স্বীকার করতে বাধো বাধো ঠেকে। সত্য কথা এই যে মানুষের মন বদলেছে, সভ্যতার দরুন তার মনোভাব বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে। ভালোবাসা সেই রয়েছে, কিন্তু সেই গোপিকার দল আজকাল ননী ছানা তৈরি না করে চপ্ কাট্‌লেট ভাজছেন, ইব্‌সেন, মেটারলিঙ্ক পড়ছেন, (থুড়ি, এঁরাও বুঝি পুরাতন) ফলে প্রেমের ভাষাও বদলাচ্ছে। ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেমের প্রকৃতিও বদলাচ্ছে। অতএব বিচিত্র সুরের ও মিশ্রণের প্রয়োজন রয়েছে। সে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ মিটিয়েছেন— হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতির abstract nature-কে concrete করে, এক কথায় সুরকে humanise করে, অথচ তাকে আর্ট থেকে artifice-এর নিচু পঙ্‌ক্তিতে নামতে না দিয়ে। শুনেছি ও পড়েছি বিলেতে বীট্‌হোফেন্ এই কার্য করেছিলেন। যদি সত্য হয়, তা হলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরই সঙ্গে তুলনা করা চলে, আমাদের দেশে তাঁর সমতুল্য composer জন্মায় নি।

রসোপভোগ

রসানুভূতির বাধা-বিপত্তি অনেক। শ্রদ্ধার ও শিক্ষার অভাবে, পূর্ব-পরিচয় কিংবা নূতনত্বের মোহে রসানুভূতি থেকে আমরা অবান্তরের খাদ বাদ দিতে পারি না। সেজন্য নিজেরাই অনেক সময় নিজেদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করি। সংগীতে রবীন্দ্রনাথের দান আমাদের আনন্দের একটি শ্রেষ্ঠ উপাদান, তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার চরম বিকাশ। মনকে কিভাবে বাঁধলে, সংগীতকে কিভাবে দেখলে আনন্দের অনুভূতি গভীর ও প্রশস্ত হয় তারই ইঙ্গিত দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রদ্ধার অর্থ অন্ধভক্তি নয়। শিক্ষার অর্থ কৃচ্ছ্রসাধন নয়। কোনো বস্তুকে আত্মগত সংস্কার কিংবা কামনার বহির্ভূত করে দেখাই হচ্ছে শ্রদ্ধার তাৎপর্য। এই বহিষ্করণের প্রক্রিয়ার নাম শিক্ষা ও সাধনা। বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষার অন্য দিকটা, বাহিরকে অন্তরে আনার দিকটা, লোপ পাচ্ছে।

এই যুগের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ঐতিহাসিক তুলনামূলক ও বৈজ্ঞানিক বিচারই প্রামাণ্য। সুর সম্বন্ধে অবশ্য পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কিন্তু সেটা ঠিক সুর নিয়ে নয়, স্বর নিয়ে, আমাদের দেশেও নয়, পরের দেশে, যেখানে সুরের পক্ষে স্বরের মূল্য আমাদের মূল্য হতে পৃথক। সেজন্য বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তের কথা তোলা বোধ হয় এ-ক্ষেত্রে উচিত নয়, শুধু এই বলা যায় যে, ভালো লাগা বা না-লাগা অনেক সময় অভ্যাসের ওপরই নির্ভর করে। এই সুপরিচিত তত্ত্বটি পরীক্ষার দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। নিতান্ত অপরিচিত সুর-পদ্ধতি শিক্ষা করে তাকে অভ্যাসে পরিণত করার সুবিধা যখন আমাদের নেই, তখন তুলনামূলক বিচারও বেশি দূর করা যায় না।

রসানুভূতির পূর্বোক্ত বাধা-বিপত্তির ওপরে এখানে আবার এক নতুন বিপত্তি আশ্রয় করে— তার নাম দেশাত্মবোধ। অতএব ঐতিহাসিক বিচারই প্রকৃষ্ট। যদি কোনো ওস্তাদ হিন্দুস্থানী সংগীতে, অর্থাৎ এককালীন দেশী ও দরবারী সংগীতের ইতিহাসে শিক্ষিত হন, তবে সংগীতের ইতিহাসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতকে খুব উচ্চ স্থানই দেবেন কল্পনা করা যায়।

শ্রদ্ধার পক্ষে বিশেষ একটি অনুকূল অবস্থা হচ্ছে, ঐতিহাসিক মনোভাব। এই মনোভাবের বশে অনেক সংকীর্ণতা দূরে সরে যায়, গতির আনন্দে মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, যদি না অবশ্য ইতিহাসের মোহে মন ইতিমধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে, চলার নেশায় রসের সন্ধান না হারিয়ে যায়।

হিন্দুস্থানী সংগীতের ইতিহাস আমাদের ভালো করে জানা নেই। যতটুকু জানা আছে তার সারসংগ্রহ এই। পাঠান ও তার পরবর্তী যুগ থেকেই মার্গসংগীত দেশী সংগীতের স্পর্শদোষ দুষ্ট হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধির চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। একেই শহর-দরবারের জীবন গ্রাম্যজীবন থেকে পৃথক, আবার প্রাদেশিক অর্থ-সংগীত কথিত ভাষায় লেখা, তার উপর ভক্তির বন্যায় দেশ ডুবে যাচ্ছে; এ ক্ষেত্রে দেশী ও দরবারী সংগীতের মধ্যে অদানপ্রদানের সম্বন্ধে দেশী সংগীতের দানই বেশি হওয়া স্বাভাবিক। মার্গসংগীতও মুখে মুখে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। পণ্ডিতরা শাস্ত্র লিখতে শুরু করলেন; কিন্তু নানা পণ্ডিতের নানা মত। এই অরাজকতায় আদানপ্রদান ও মিশ্রণের কার্য সহজ হয়ে ওঠে। তারই ফলে অনেক নতুন ধরনের সুর, তাল ও ভঙ্গির সৃষ্টি হয়। সেগুলি পরে দরবারী সংগীতে উচ্চ স্থান পায়। যে ধ্রুপদকে আমরা দেবতার স্কন্ধে চাপাই, যার অন্তত দ্বিতীয় জন্মভূমি গোয়ালিয়র অঞ্চলে; সেটি একটি প্রাদেশিক বা দেশী সুরপদ্ধতি। আকবর

বাদশাহের দরবারে ধ্রুপদ গাওয়া হয়েছিল বলে লোকে আক্ষেপ করেছিল, লেখা আছে। মার্গসংগীতের কৌলীন্য এইপ্রকারে ভেঙে যায়; দেশী সংগীত থেকে তার আত্মরক্ষা করার উপায় ছিল না। ক্রমে ক্রমে হোরি, টপ্পা, ঠুংরিও এল। লোকে বলে খেয়াল তার আগেই তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়া অনেক প্রাদেশিক সুর আমাদের তথাকথিত উচ্চসংগীতে গৃহীত হয়েছে মনে হয়, যে-সব সুরের উল্লেখ পর্যন্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। মোদ্দা কথা এই যে মোগলদের আমল থেকেই শাস্ত্রোক্ত মার্গসংগীত লোপ পেয়েছে, তার বদলে 'দরবারী' সংগীত এসেছে, সে সংগীত 'যবনস্পৃষ্ট' ও অশাস্ত্রীয়। অর্থাৎ মার্গসংগীত দরবারী সংগীত নয়। আমরা যাকে ক্ল্যাসিক্যাল বলি সেটা দরবারী — তার ঠাট বেলাওলের। মার্গসংগীত হিন্দুস্থানের শাস্ত্রেই আছে— কণ্ঠে নেই, তার অন্তত একটা ঠাট কনকাঙ্গী। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রোক্ত কোনো-একটি সুরের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রূপ ও প্রসার পদ্ধতি দরবারী সংগীতে প্রবেশলাভ করেছে, এ খবরও আমরা জানি। বাঙালী ওস্তাদ পঞ্চম বাদ দিয়ে দুই মধ্যম, ও শুদ্ধ ধৈবত ব্যবহার করে যে আসরে বসন্তের ধ্রুপদ, ধামার গান, সেই আসরেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ওস্তাদ বসন্তে পঞ্চম জোর করেই লাগান, কোমল ধৈবত ব্যবহার করেন। দরবারী গানে বসন্তের দুই রূপের, দুই ভঙ্গিরই যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। তালের বেলায়ও তাই— একদেশের যৎ সাত, অন্যদেশের আট মাত্রার, ঝোঁক বদলে বাংলাদেশের ঢিমে তেতালাকে বাংলার বাইরে তিলুয়াড়া বলা হয়।

আবার বড়ো বড়ো ওস্তাদের রচিত সুর ও প্রকাশভঙ্গিও অভিনন্দিত হয়েছে, যেমন বিলাসখানি টোড়ী, খোন্দিমল্লার, মিয়াকী মল্লার, হোসেনী কানাড়া, হদ্দু খাঁ, তানরাজ খাঁ, জাকরুদ্দিনের ঘরোয়ানা তান ও গমক। যন্ত্রের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই— মসীদ খানী, রেজা খানী গতের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও দুটিই

ওস্তাদরা সমান ভক্তিসহকারে বাজিয়ে থাকেন। অতএব ইতিহাসের দিক থেকে বলতে হয় যে, আমাদের সংগীত একটি অচলায়তন নয়; তাতে কোনোপ্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, তার ইতিহাস আছে, গতি আছে, অভিব্যক্তি আছে, পরিণতি আছে। এই মূল কথাটি প্রত্যেক সমালোচক, শিক্ষার্থী ও রসপিপাসুর জানা উচিত, জানলেই রবীন্দ্রনাথের সংগীতের ওপর শ্রদ্ধা আসবে। আমাদের সংগীতের অভিব্যক্তি নেই, কেননা সেটি অপৌরুষেয় ও সর্বাঙ্গসুন্দর, অতএব রবীন্দ্রনাথের সংগীতে কৃতিত্ব কিছু থাকতে পারে না— মনে করার মতন আমাদের সংগীতের অপমান আর কিছু হতে পারে না। সত্যিই 'মরার বাড়া গাল নেই'।

এ তো গেল ইতিহাসের মাত্র একটা দিক। হিন্দুস্থানী সংগীতের পটভূমিতে রবীন্দ্র-সংগীতের এবং তাঁর ব্যক্তিগত মৌলিকত্ব কোথায় জানতে হলে আমাদের দেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের গত শতাব্দীর মানসিক ইতিহাসের পাতা উল্‌টে দেখা উচিত। ইংরেজ বণিক প্রথমেই পশ্চিমী সভ্যতা এদেশে বহন করে আনে নি। ইংরেজ বণিকের আশ্রয়ে দেশে বিশেষত কলকাতা প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্রে, একদল বিত্তশালী ব্যবসাদারের সৃষ্টি হয়। তাঁরা দেশের অর্থ না বাড়িয়ে নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। দেশের মাটির সঙ্গে, মনের সঙ্গে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কোনো সংস্রব ছিল না। পরে অনেকে তাঁরা জমিদার হন, কিন্তু সেই আদিম অভিশাপ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। যখন ইংরেজ বণিক রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলে, তখন দেশের কৃষ্টি দেশী রাজদরবারে, পুরাতন ও কয়েকজন জমিদারের বৈঠকখানায় আত্মগোপন করল। তখনও আমাদের দেশের চারুকলা একেবারে লোপ পায় নি— তখনও ইংরেজ বলতে রাজার জাতি বোঝাত, তখনও ইংরেজ পশ্চিমী সভ্যতার বাহক হলেও প্রতিভূ হয়ে ওঠে নি। সর্বক্ষণ বন্ধ ঘরে আত্মরক্ষায় বদ্ধ-

পরিকর হলে যা হয় চারুকলার তাই হল— লীনা শীর্ণা শুচিবাইগ্রস্তা বিধবার মতন। এই সময়কে সংগীতের ছুৎমার্গের যুগ বলা যেতে পারে। অশুদ্ধ-শুদ্ধ বিচার করাই জীবনের একমাত্র কাজ হয়ে উঠল। কিন্তু এই সময় এক মহাপুরুষ জন্মালেন। রাজা রামমোহনের কৃপায় আমাদের মনের জানালা দুয়ার খুলে গেল; আমরা মুক্ত হাওয়া পেলাম; আমরা বুঝলাম, বিদেশী গবর্নমেন্টের পিছনে আছে এক বড়ো সভ্যতা, সে সভ্যতাকে ভিক্টোরিয়ান যুগের শুচিবাইগ্রস্ততা পর্যন্ত নষ্ট করতে পারে নি— সে সভ্যতা নিতান্তই জীবন্ত, এবং তার মূল কথা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির গ্রহণ করবার, দান করবার, সৃষ্টি করবার স্বাধীনতা। এই বার্তা জোড়াসাঁকোর এক বাড়িতে পৌঁছল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ইংরেজ জাতির অভ্যাসকে অনুকরণ করাটাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য কখনও ভাবেন নি। দেশী রাজোয়াড়ার দরবার থেকে অনেক গুণী কলকাতায় ঐ সময় জমায়েত হন। কলকাতা তখন রাজধানী, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার সম্প্রদায় কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন, শহরের বড়োলোকেরাও শৌখিন হলেন— মেটেবুরুজে ওয়াজিদ আলি শা'র দরবার তখনও সরগরম; মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন সংগীতের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁরা পৃষ্ঠপোষক হয়েই রইলেন। তাঁদের কৃপায় অনেক গুণী অন্নাভাবে, অনেক সুর অভ্যাসাভাবে লোপ পেল না। তাঁরা সংগীতকে বাঁচিয়ে রাখলেন। কিন্তু মুক্তির বীজ পড়ল, সৃষ্টির শুরু হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। ধর্ম, সমাজ, চারুকলার প্রত্যেক বিভাগেই এই বীজ অঙ্কুরিত হল। আবহাওয়া নিতান্তই অনুকূল ছিল। এ বাড়িতে বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে আসতেন, প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে হাতে নাড়া বেঁধে গানবাজনা শিখতে হত। জ্যোতিবাবু ছিলেন এই দলের অগ্রণী, তিনিই রবীন্দ্রনাথকে সংগীত-রচনায় প্রথম উৎসাহ দেন। তিনিই পিয়ানোতে দেশী, বিদেশী, সবরকমের

সুরের মিশ্রণ করতেন, আর ছোটো ভাইকে বলতেন গান রচনা করতে। পশ্চিমী সভ্যতাকে অন্ধ অনুকরণের যুগের পর, সেই সভ্যতার যাথার্থ্য মর্মে গ্রহণ করার যুগে, মানসিক স্বাধীনতার ফলে পুরাতন-নূতনের বিবাহের শুভ সন্ধিক্ষণে, সর্বতোমুখী সৃষ্টিপ্রেরণার আবেষ্টনে ও প্রভাবে, রবীন্দ্রনাথ সংগীত রচনা করতে আরম্ভ করেন।

এ তো গেল শুধু ঐতিহাসিক আবেষ্টনের দিক। আবেষ্টনকে সৃষ্টির কাজে কি করে লাগানো হল বুঝতে গেলে কবির অন্য দিকটা দেখতে হবে। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ পথিক— অল্প বয়স থেকে তিনি নানা কাজ ও অকাজের ছলে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। বাংলাদেশের বাউল, কীর্তন, ভাটিয়াল প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাদেশিক অর্থাৎ দেশী সুর-পদ্ধতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে, দেশের প্রাণের সঙ্গে যোগ তাঁর খুবই নিবিড় ছিল। সেজন্য বিদেশী সভ্যাতার কল্যাণে পুষ্ট স্বাধীন চিন্তা ও সৃষ্টির দ্বারা এই দেশের, গ্রামের পলিমাটি কেটেই বইল। মুমূর্ষু হিন্দুস্থানী দরবারী সংগীতকে দেশী সুরের রক্তে সঞ্জীবিত করাতে রবীন্দ্রনাথ জীবনধর্মেরই অনুগমন করলেন। সৃষ্টি তখনই সুন্দর হয় যখন সেটি জীবনধর্মের অনুগমন করে। শহর ও দরবারের কৃষ্টি দেশের প্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই ধ্বংসোন্মুখী হয়, এবং তার পূর্ণ-জীবনের জন্য এককালীন ঘর ও বাহির থেকে শক্তি অর্জন করতে হয়, মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত করতে হয়। এই কথাটি শ্রোতার স্মরণ রাখা উচিত, এবং স্মরণ রাখলে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আসবেই, তাঁর দানের মৌলিকত্বকে মর্যাদা দিতেই হবে। মাটির সঙ্গে যোগ স্থাপন করে হিন্দুস্থানী সংগীতকে পুনর্জীবন দান করা তাঁর কীর্তি।

রস-উপভোগের আরো দু-একটি অন্তরায় আছে। যা চলে আসছে, যাতে মানুষ অভ্যস্ত, যেটি ঐতিহ্যের ধারা বলে গৃহীত

হয়েছে, তার একটি ধাক্কা দেবার ক্ষমতা আছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। আদত কথা কিন্তু এই যে, গতানুগতিকতার ফলে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলী একটি বিশেষ আকারে সজ্জিত হয়; তারই ফলে অভিজ্ঞতাগুলির সেই ধারায় গ্রথিত হবার, নকশায় সজ্জিত হবার একটা ঝোঁক থাকে। পুরাতন অভ্যাসের নকশা কিন্তু নতুন অভ্যাস অর্জনের পথে বাধা দেয়। নতুন-পুরাতনে বিরোধ বাধে। সেই-সঙ্গে তাদের মধ্যে নির্বাচনকার্য চলে। নতুন অভিজ্ঞতাগুলি কার্যকরী প্রতিপন্ন হবার পর তারা দানা বেঁধে প্রিয় ও সুখজনক হয়ে ওঠে। মূল্যবিচারের পিছনে, জনসাধারণের সমালোচনার অন্তরালে এই বিরোধান্তের অভ্যাসজনিত সুখের স্পৃহা রয়েছে। সেজন্য আমরা পরিচিতকে ভালোবাসি ও অপরিচিতকে ডরাই। কিন্তু অপরিচিতটি যখন কোনো কারণে, কোনো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার দৌলতে, কোনো অভিভাবনের মৃদু তাড়নায়, স্বার্থের জন্য, কিংবা অন্য কোনো কারণে স্থায়ী হল, সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করল, তখন, পরিচিত জন-মতের আড়ালে সাধারণ লোক নবতর সৃষ্টি করবার দায়িত্ব ও তাকে যথার্থ মূল্যদানের কর্তব্য ও ভয় থেকে মুক্ত হল, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার দায়িত্ব জনমতের হাতে সঁপে দিয়ে লোকে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

গ্রহণ, বর্জন ও নির্বাচনের পিছনে যখন এই স্নায়ুঘটিত, অর্থাৎ দেহগত সুখের সন্ধান রয়েছে, তখন ভালোমন্দর বিচারে, বিশেষত চারুকলার সমালোচনায় অভ্যাসের অর্থাৎ জনমতের স্থান অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু অভ্যাস চিরন্তন নয়, নিতান্তই সময়সাপেক্ষ, বাইরের আঘাতে ভেঙে যায়। এইজন্যই আজকার রোমান্টিক্ কালকার ক্লাসিসিস্ট হয়ে ওঠে এবং সেইজন্যই ঐ দুটি বুলির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গান ওস্তাদী গানের অপেক্ষা নিচু স্তরের বলার কোনো সার্থকতা নেই। মনের পিছনে দেহ থাকলেও, দেহ দিয়ে শ্রেষ্ঠ

মানসিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না, মাত্র অভ্যাস দিয়ে সৃষ্টির শেষ ফলের মূল্যবিচার চলে না। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, অনভ্যস্ত তাল ও স্বর-যোজনা অনবরত কানে এলে ভালো লাগে— ভালো-মন্দর কথা তখন ওঠেই না।

অন্য একটি বিপদ রয়েছে। মানুষ যে শুধু অভ্যাসের দাস, স্বীকার করতে মানুষেরই অহংবুদ্ধিতে আঘাত পড়ে। সেজন্য মানুষের ইচ্ছা হয়, প্রত্যেক অনভ্যস্ত অভিজ্ঞতাকেই শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করতে— তা সেটি পুরাতনের সঙ্গে খাপ খাক্ আর নাই খাক্। বরঞ্চ নতুন অভিজ্ঞতা যতই অস্বাভাবিক, যতই খাপছাড়া, যতই বিসদৃশ হয়, ততই বরেণ্য হয়ে ওঠে। এটি অভিমান এবং অনেক সময় প্রথম অবস্থারই প্রতিক্রিয়া। স্থিতিশীলতা ও চিরন্তন চলিষ্ণুতা একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। প্রথম অবস্থার সুবিধা এই যে ঐতিহ্যের সাহায্যে রুচির মেরুদণ্ড ও বিচারের মাপদণ্ড তৈরি হয়। দ্বিতীয় অবস্থার সুবিধা এই যে, গতিশীল ও পরিবর্তনশীল জীবনের আসরে সৃষ্টির জন্য পরীক্ষা করা চলে, নিজের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসে। এই দুই অবস্থা, অর্থাৎ অভ্যাসের দাসত্ব এবং নতুনত্বের মতিহীন গতি ভিন্ন অন্য একটি অবস্থা ও মনোভাব আছে। তার বিশেষত্ব হল ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের মতি নির্ণয় করা। তার গুণ সাময়িক আপেক্ষিকতার হাত থেকে মুক্তি, যে-মুক্তি সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হবে। বলা বাহুল্য, আমি প্রতিভাশালী স্রষ্টাকে নির্দেশ করছি। এতএব, প্রত্যেক সমালোচকের কর্তব্য হচ্ছে, স্নায়ুগত অভ্যাস এবং নতুনত্বের স্নায়বিক সুখ ও মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সংগীতে ঐ অতিরিক্ত অবস্থার সন্ধান করা। সমালোচকের কান যদি শুধু দরবারী সংগীতে কিংবা শুধু দেশী সংগীতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলে তাঁর আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাবার কোনো আশা নেই। কিন্তু দুইপ্রকার হিন্দুস্থানী সংগীতেরই রসগ্রাহী হয়ে, কবিতার রস-

গ্রহণ করবার ক্ষমতা অর্জন করে এবং নব নব রূপের সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধানে ব্যগ্র হয়ে যদি কোনো সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সংগীত শোনেন তা হলে তাঁর আনন্দের মাত্রা বেড়েই যাবে। রবীন্দ্র-সংগীতে তার অভ্যাস, অনভ্যাস, প্রধান কথা নয়; আসল কথা তার যোগ সাধন, সৃষ্টিতত্ত্ব। এই কথাটি ঐতিহাসিকেরও স্মরণ রাখা উচিত। সৃষ্টি আমাদের সংগীতে সম্ভব, এবং অভ্যাস-অনভ্যাসের মিশ্রণের ফলে একটি অভিনব রূপ সৃষ্টি হতে পারে স্বীকার করলে নিজেকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হয় না, বরঞ্চ রসোপভোগের যথেষ্ট সুবিধা হয়। তার পর যদি রূপটি সত্যিকারের মোহন হয় তা হলে তো কথাই থাকে না, মন আনন্দে ভরে ওঠে।

মন তৈরির কথা ছেড়ে দিলে, ভেতরের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, রসবস্তুর রূপ, তার প্রকাশ যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই আনন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান তৈরি হল। আনন্দের সাক্ষাৎ উপাদান ও অব্যবহিত কারণ হচ্ছে সম্পূর্ণতা। বিষয়বস্তু, রূপ ও প্রকাশ-পরতাকে পৃথকভাবে দেখলে আংশিক সুখ হতে পারে, কিন্তু আনন্দ হয় না। আনন্দের জন্য সম্পূর্ণতা চাই। একটি বাদ দিলেই আনন্দ দৈহিক সুখে পরিণত হল। রবীন্দ্রনাথের সংগীতে সৃষ্টির সম্পূর্ণতা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। যে ভাবটি তিনি গানের রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে চান, সেটি সুরের উপযুক্ত, সেটি বিষয়বস্তু হিসেবে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান, এবং অতি সুন্দর রূপেই ব্যক্ত বলে সম্পূর্ণ। হিন্দুস্থানী সংগীতে, বিশেষত ধ্রুপদ ও খেয়ালে ভাবাত্মক গান নেই যে তা নয়; কিন্তু সকলেই জানেন যে ভাবগুলির সংখ্যা অর্থাৎ বৈচিত্র্য কম, এবং বেশিরভাগ গানেই ভাবের কোনো স্থান নেই; থাকলেও গায়কের কণ্ঠে ভাবের সঙ্গে রূপের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

হিন্দুস্থানী সংগীতে সুরের বিকাশ রচয়িতার কি গায়কের

ব্যক্তিগত ভাবের, কিছু হলেও, বড়ো বেশি ধার ধারে না। কেবল তাই নয়, এবং এই কথাটি দরকারী, গায়কের কণ্ঠে গায়নপদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য, উচ্চারণ, অলংকার, সামঞ্জস্যবিধানের জন্য, মিষ্টতা ও অমিষ্টতার জন্য, একই রাগিণী যে ভিন্ন রূপ অর্জন করে সেটা কোনো ব্যক্তির ভাবগত রূপ নয়। আমরা বলি, কী দরদ, কী ব্যঞ্জনা! কিন্তু ধ্রুবপদ্ধতির গানে ঐপ্রকার মন্তব্য নিতান্ত অবান্তর। সেখানে যে ভাব ফোটানো চাই সেটা রাগিণীর। রাগিণীর ভাব ও রূপ, ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, মোটেই নয়। কিন্তু এইখানেই রবীন্দ্র-নাথের সংগীতের কৃতিত্ব। ভাবকে হিন্দুস্থানী গানে যা মূল্য দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি মূল্য তিনি দিয়েছেন এবং দিয়েও তিনি সুরের সম্পূর্ণতাকে ছোটো করেন নি। অথচ তাঁর গান কেবল কথার তান, কিংবা ভাবের বিলাস নয়। তাঁর গান এক-একটি চিত্তবৃত্তি বা mood-এর ভাবগত বিকাশ। গায়ক সেই mood ধরতে পেরে যদি তাকে রূপ দিতে পারেন তা হলে সে রূপটা হিন্দুস্থানী দরবারী সংগীতের চেয়ে বেশি সহজ এবং পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। সাধারণকে ব্যক্তিত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ করলে আমাদের আনন্দ বেড়েই যায়। সম্পূর্ণতাকে রূপ দেবার জন্য এই উপায় নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী। সাধারণ ভাবের পক্ষে স্বর-বিন্যাস বেশি উপযুক্ত হলেও সীমাবদ্ধ, বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত ভাবের পক্ষে উপযুক্ত কথা ও ভাবের সম্যক মিশ্রণ বেশি মূল্যবান। তবে, সুরের প্রকাশে স্বরের ব্যত্যয় কোনো ক্ষেত্রেই শোভা পায় না।

তার পর আসে রূপের কথা। বাক্য, অর্থ, ভাব এবং এই তিনের সুসমঞ্জস প্রকাশেরই নাম হচ্ছে রূপ। রূপের সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে রচয়িতার প্রদত্ত রূপকে ভিন্ন আকৃতি দিতে গায়কের একটু কুণ্ঠিত হওয়া উচিত। বিচারের জন্যও রূপটি রচয়িতার, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া রূপ হওয়া চাই। সে-রূপকে বিকৃত করে

যে-রূপ গায়ক তৈরি করেন তাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুরের রূপকে বিচার করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের 'দেওয়া' রূপ কথাটা হয়তো ভুল, কেননা যাঁরা তাঁর গান-রচনা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই জানেন যে, তাঁর কাছে সুর ও কথা একত্র আসে, হরগৌরীর মতন। হরকে গৌরী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে হরকে পিশাচ এবং গৌরীকে শীর্ণা কুমারী বলে ভ্রম হয়। সুর ও ভাবার্থক কথার মিলনে রূপ, এবং সে-রূপ তখনকার জন্য, তার অন্তরের সত্তায় বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ। যদি কোনো গায়ক তাঁর কথাকে নিজের রচিত সুরে বসান, কিংবা তাঁর সুরকে নিজের কথার উপর চাপিয়ে দেন, তা হলে জিনিসটা বীভৎস হয়ে ওঠে। প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে সেটি সাধারণত গায়কের উপরই নির্ভর করে। গায়ক কতটা গানের ভাবকে নিজস্ব করতে পেরেছেন, কথাগুলিকে কতটা শ্রদ্ধা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন, সুরের বৈশিষ্ট্য কতটা রক্ষা করতে পারেন, গানের সম্পূর্ণতাকে কতটা অটুট রাখতে পারেন, এই-সবের উপর তাঁর প্রকাশ মাধুর্য নির্ভর করে। এক হিসাবে তাঁর কাজ ওস্তাদের চেয়ে সহজ, অন্য হিসাবে শক্ত। তাঁর স্বাধীনতা কম, কিন্তু তিনি সাহায্য পান বেশি। স্বাধীনতার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাঁকে কৃতিত্ব দেখাতে হবে বলেই তাঁর নৈপুণ্যের প্রয়োজন মনে হয় বেশি।

রবীন্দ্রনাথের গানের সম্বন্ধে এই কয়টি মোটা কথা স্মরণ রাখলে দেখা যাবে যে তিনি হিন্দুস্থানী সংগীতধারার বিপক্ষে যাওয়া দূরে থাকুক, সেই ধারাকেই দেশী সংগীতের সংস্পর্শে ও ব্যক্তিগত ভাবের সম্পর্কে এনে নতুন জীবন দিয়েছেন। শ্রদ্ধা সহকারে দেখলে, ইতিহাসকে খাতির করলে, সংগীতকে ভালোবাসলে, রসিক হলে, অবান্তরকে বাদ দিলে হয়তো দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের স্থান সংগীত ইতিহাসে খুব উঁচুতে। নতুনকে অপরিচিত বলে অবজ্ঞা না করলে অনেক সময় দেখা যায় যে, সেটি পুরাতনের রূপান্তর,

সনাতনেরই বিকাশ। সনাতনকে পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে, তার মধ্যে অনেক সময় নতুন জীবনের আভাস রয়েছে। . রস-উপভোগের এই হল জ্ঞানগত ভিত্তি। ভালো লেগেছে— এইটাই যথেষ্ট নয়।

যাঁরা যন্ত্রসংগীত ভিন্ন অন্য সব সংগীত অশুদ্ধ, অতএব হেয় বিবেচনা করেন, তাঁদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখছি না। যাঁরা মনে করেন যে হিন্দু সংগীতের ইতিহাস অবনতির ইতিহাস তাঁরা আমার প্রচেষ্টাকে কৃপার চক্ষেই দেখবেন, অতএব প্রতিদানে তাঁদের কোনো অনুরোধ পর্যন্ত করতে সাহস হয় না। যাঁরা বলেন, দেশে বাঙলা গানেরই ভবিষ্যৎ আছে, হিন্দুস্থানী ঢং অচল, কিংবা হিন্দুস্থানী গানই চলবে, বাঙলা গানের আয়ু দুদিনেই শেষ হবে— তাঁদের কোনো প্রবন্ধই আদ্যোপান্ত পড়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁদের দিব্যচক্ষুতে সমগ্র ভবিষ্যতের আভাস সুস্পষ্ট।

আমি লিখছি তাঁদের জন্য যাঁদের ইতিহাসের যুক্তির ওপর বিশ্বাস আছে, সংগীতে কথাকে সাপের বিষের মতো নেই নেই করে উড়িয়ে দিতে চান না, এবং হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতিটাই বাঙলা অঞ্চলের ধ্রুবপদ্ধতির ভূমিকা মানেন এবং তুলনামূলক বিচারে বুদ্ধি এবং ঘটনাকেই প্রধান করেন। মূল্যদান সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে শ্রীবৎস চিন্তার গল্পটি স্মরণ করাতে চাই। মূল্যদানের পূর্বে মিল-গরমিল দুধারেই সমানে নজর রাখতে হবে। তুলনার ক্ষেত্রটি যদি সমান না হয়, তবে তুলনাটি হবে সংস্কারেরই সংস্কার। টাকাকে আনা দিয়ে ভাগ দেবার পূর্বে তাকে আনাতে পরিণত করে পঞ্চম শ্রেণীর বালক, কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো না বাংলা গান ভালো আলোচনা করবার সময় এই বালকসুলভ ফন্দিটি বয়স্করাও ভুলে যান। তাঁদের দোষ নেই, কারণ বড়ো-ছোটো, আগে-পিছে, জয়-পরাজয়, ইত্যাদির বিচারকেই শিক্ষা বলা হয়। প্রকৃতিগত পার্থক্য, পরিপ্রেক্ষিতের ভেদ, পরিণতির হারের বৈষম্য বোঝবার পক্ষে

আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি একটি প্রধান অন্তরায়। কিন্তু প্রকৃত তুলনা ও মূল্যবিচার আমাদের করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত সমালোচনার জন্য তাঁর পূর্ববর্তী সময়কার বাঙলাদেশে উচ্চসংগীতের ইতিহাস জানা চাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে ইতিহাস কেউ লেখেন নি। আমরা কেবল জানি যে বাঙলাদেশে ধ্রুপদের ও টপ্পার যতটা প্রচলন হয়েছিল, খেয়াল ঠুংরির ততটা হয় নি। কৃষ্ণধনবাবু যন্ত্রকেই সেজন্য দায়ী করেছেন। তাঁর মত আংশিকভাবে সত্য। কারণ, তারের যন্ত্রের প্রভাব সুবিস্তৃত থাকলে কণ্ঠসংগীতে শ্রুতির প্রাধান্য ধরা পড়ত; এবং বাঙালী গায়কের কণ্ঠ শ্রুতিশুদ্ধ ছিল কেউ বলেন নি, অন্ততঃ থাকলে অত সহজে হারমোনিয়মের কৃপায় কণ্ঠের সর্বনাশ হত না। বোধহয়, উপযুক্ত সংগতের জন্যই ধ্রুপদকে আমরা সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ হই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে গোলাম আব্বাস নামে একজন বিখ্যাত পাখোয়াজী বাঙলাদেশে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, তাঁর দুজন বিখ্যাত শিষ্যের নাম নিতাই ও নিমাই চক্রবর্তী। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ভাই কেশব মিত্র এবং ঝামাপুকুরের মুরারী গুপ্ত মহাশয় তাঁদেরই ঘরোয়ানা। বিংশ শতাব্দীর প্রায় সব শ্রেষ্ঠ বাঙালী পাখোয়াজীই কেশববাবু ও মুরারীবাবুর শিষ্য। নগেনবাবু, দুর্লভবাবু, দীন হাজরা প্রভৃতি বাদক সেদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে ধ্রুপদের মর্যাদা-দানে সহায়তা করেছেন। দুর্লভবাবু ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ এখনও ভাঙাহাটে বাজান।

এদেশে ধ্রুপদের প্রচলনের অন্য কারণ বোধহয় লোকসংগীতের উন্নতি। অন্যান্য প্রদেশে লোকসংগীত বরাবরই ছিল কিন্তু, খুব সম্ভব, আমাদের কীর্তনের মতো উৎকর্ষ লাভ করে নি। কীর্তনের সুর ও তালের বৈচিত্র্য হয়তো হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংঘাতেই সৃষ্ট। ভজনের গায়কী অপেক্ষাকৃত একঘেয়ে লাগতে পারে, একথা

প্রাদেশিক হিংসার যুগে ধ্রুবপদ্ধতির জন্মভূমিতে অ-বাঙালীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। লোকসংগীতের প্রভাবের সঙ্গে ধ্রুপদ-প্রচলনের যোগ আছে। সে যোগ আন্তরিক। লোকসংগীতে তানের অভাব, ধ্রুপদেও তান নেই; লোকসংগীত অর্থমূলক, অর্থও আবার সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক, রূপ তার কবিতার, রস তার অনুভূতির; অন্যধারে পুরাতন ধ্রুপদের অর্থ তখনও উচ্চারণ বিভ্রাটে অস্পষ্ট হয় নি, রচনাগুলি ছিল সাধারণতঃ ধর্মভাবাপন্ন, কাব্যাংশও তার হেয় ছিল না। তা ছাড়া, কথার গায়কী-উচ্চারণ পদ্ধতিতে খেয়ালিয়ার অপেক্ষা ধ্রুপদিয়ার সঙ্গে বাউল কীর্তনিয়ার মিল নিবিড়তর। লোকসংগীতে অন্তের স্বরবর্ণ টেনে এবং দম ছেড়ে গাওয়া হয়, তাই গানের পক্ষে বাঙলা ভাষার স্বাভাবিক অনুপযোগিতা শ্রোতা ততটা অনুভব করতে পারে না। খেয়ালে কথার যেখানে ফাঁক সেইখানেই তান চলে এবং তানের জন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন। উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ ব্রজভাষায় রচিত হত, সে ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলি কিংবা পূর্ববঙ্গের ভাষার গরমিল যথেষ্ট থাকলেও অন্ততঃ দুটি একটি বিষয়ে, যেমন যুক্তবর্ণের ও স্বরবর্ণের ব্যবহারে কিছু মিল পাওয়া যায়। এই মিলনই গায়কের অবলম্বন। পরে এই বিষয়ে আলোচনা করব। ভাষা বাদ দিলেই লোকসংগীতের ঋজুতা, গাম্ভীর্য, ঐশ্বর্য-হীনতা, সরলগতি, সংযম, অন্তর্মুখিনতা ধ্রুপদকে যতটা স্মরণ করায় খেয়ালকে ততটা করায় না। এইপ্রকার মিলের জন্য বাঙলাদেশে ধ্রুবপদের প্রচলন খেয়াল অপেক্ষা সহজ হয়। বলা বাহুল্য, সব অঞ্চলের কীর্তন সমানভাবে সহজ নয়। এমন কীর্তনও শুনেছি যার ঐশ্বর্যের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর স্থাপত্যেরই তুলনা চলে।

যাঁরা সামাজিক ব্যাখ্যায় আস্থা রাখেন না, তাঁরা নামের ভক্ত। অবশ্য নামগুলি ইতিহাসের রাস্তায় স্তম্ভের মতন। বিষ্ণুপুরে অনেকদিন পূর্বেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতি এসেছিল। কারণ ছিল

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজা বৈষ্ণব হবার পরেই সেখানে সুকুমার শিল্পের একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কিন্তু বেহার অঞ্চল থেকে উড়িষ্যা যাবার পথে বিষ্ণুপুর পড়ে, সেইজন্য বিষ্ণুপুরে কেবল কীর্তনের চলন হল না, উত্তরপ্রদেশের মুসলমানোচিত প্রকর্ষের প্রভাব সেখানে স্বীকৃত হল। কীর্তন ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়ায়, এবং বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে ধ্রুবপদ্ধতি শেখাতে আরম্ভ করলেন। তানসেনের বংশধর জ্ঞান খাঁ, প্যার খাঁ ও জাফর খাঁর মতো বিখ্যাত গায়কের ঘরোয়ানা বেহার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। বেথিয়া তখন বাংলার অন্তর্গত ছিল বলা যায়। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের ধ্রুপদ গান বেথিয়ার দান। মহারাজ নওয়ল-কিশোর ও আনন্দকিশোর উৎকৃষ্ট রচয়িতা ছিলেন। রাধিকাবাবুর গুরু গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং তাঁর ভাই এরা কাশীর লোক হলেও বেথিয়া থেকে কলকাতায় আসেন। পূর্ববঙ্গের অনেক জমিদারবর্গ ধ্রুপদিয়া পালন করতেন। গোবরডাঙার গঙ্গানারায়ণবাবুই সর্বপ্রথম পশ্চিমাঞ্চল থেকে মুসলমান ওস্তাদের নিকট ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করে দেশে ফেরেন। এই সময়ে রাণাঘাট, শ্রীরামপুর ও পানিহাটি প্রভৃতি গঙ্গার উপকূলস্থ গণ্ডগ্রামে ধ্রুপদ গানের মর্যাদা ছিল। মৌলাবক্স্‌ও এইসময় কলকাতায় আসেন এবং বাংলাদেশ পর্যটন করেন। পূর্বোক্ত কারণে বাংলাদেশে ধ্রুপদের প্রচলন হয়। রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে ও নিকটস্থ যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরদের বাড়িতে যেসব বিখ্যাত ধ্রুপদিয়ার সমাগম হত, তাঁদের মধ্যে মৌলাবক্স্‌, যদুভট্ট, বিষ্ণুভট্টই সর্বপ্রধান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চ সংগীতের একজন মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তিনি রাগরাগিণী পিয়ানোতে বাজাতেন এবং সুরের মিশ্রণ ও বিস্তার নিয়ে নানা-রকমের পরীক্ষা করতেন। পিয়ানোতে তানবিস্তার কিংবা আলাপ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে বাল্যকাল থেকেই সেইসব পরীক্ষায়

সহায়তা করতে হত, উপযুক্ত কথা যোগান দিয়ে। বলা বাহুল্য, বাড়ির আবহাওয়ায় ছিল সংযত স্বাধীনতা এবং সুগম্ভীর ধর্মভাব, যেটি ধ্রুপদের অনুকূল। অতএব বলা চলে উচ্চসংগীতের মধ্যে ধ্রুপদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

ধ্রুপদের চিহ্ন কি? প্রায় প্রত্যেক ধ্রুপদ গানেই চারটি তুক্ কিংবা পদ থাকে। অলংকারের মধ্যে মীড়, গমক ও আশই ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদের রূপ নির্দিষ্ট। আলাপের পর অস্থায়ী গেয়ে অন্তরা গাইতে হয়, বাকি দুইটি তুক্ বা পদ প্রায় অস্থায়ী ও অন্তরারই পুনরাবৃত্তি। তান চলে না ধ্রুপদে। তালের মধ্যে চৌতাল, আড়া চৌতাল, তেওরা, ঝাঁপ, সুরফাক্তা, পঞ্চম শোয়ারির ব্যবহারই প্রশস্ত। কিন্তু ধ্রুপদে তানের বাহাদুরী দেখানো অন্যায়। গানের শেষে যৎ-সামান্য বাটোয়ারা, আড়ি, দেড়ি, কুয়াড়ি, বিসম, অনাঘাত দেখালেই যথেষ্ট হয়। ধ্রুপদের বিষয় হল ধর্ম, প্রকৃতির বর্ণনা ও রাজার গুণগান। তার গতি গজের, যেমন সর্পগতি হল ধামারের। ধ্রুপদের রস শান্ত ও গম্ভীর— বাহুল্যবর্জিত। ঐশ্বর্য তার অন্তরের। যাঁর কণ্ঠে তান অজস্র, স্বর কম্পমান, যাঁর স্বভাবে সংযম নেই তাঁর পক্ষে প্রকৃত ধ্রুপদী হওয়া অসম্ভব। ধ্রুপদের চার প্রকার বাণী আছে। তার মধ্যে ডাগর বাণী ও গোবর বাণী বেশি চলে। খাণ্ডার বাণী কিংবা গহর বাণী গাওয়া অত্যন্ত শক্ত। যাঁদের এই কয় প্রকার বাণী শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা জানেন যে হিন্দুস্থানী সংগীতে voice production বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কিন্তু ধ্রুপদ গানের বিষয়ে বৈচিত্র্য কম, তার রচনার ভাষায় কথা বেশি ও কথাগুলি চতুষ্কোণ কাষ্ঠখণ্ডের মতন, অতএব তার গায়কী-রীতিতে স্বাধীনতা প্রকাশের সুযোগ খেয়াল এবং ঠুংরি অপেক্ষা কম সকলেই স্বীকার করেন।

আজকাল অনেকের মুখে শোনা যায় যে খেয়াল ও ঠুংরিতে

গায়কের নিজের কৃতিত্ব দেখাবার স্বাধীনতা আছে। বলা বাহুল্য, উচ্চ শ্রেণীর খেয়াল ও ঠুংরি রচনায় সুরের বিকাশ অনিয়ন্ত্রিত নয়। কোন তানের পর কোনটি আসা চাই তার নিয়ম আছে, সে কথা ভালো ঘরোয়ানার গান শুনলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া, খেয়ালের তান রাগিণীর আশ্রয়ে, তার মূল প্রকৃতির অবলম্বনেই ফুটতে পারে, একথা সব ভালো খেয়ালিয়ারাই জানেন। ঠুংরিতে এই তানবিস্তার পদ্ধতির ওপর আছেন নায়ক-নায়িকা ও তাঁদের মেজাজ। খেয়াল-ঠুংরিতে তানের স্বাধীনতা যে যথেচ্ছাচারিতা নয় বলাই বাহুল্য।

মোদ্দা কথা এই— রবীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকে সংযত সংগীতেই পরিপুষ্ট। তাঁর প্রতিভা অল্প বয়সেই বিকশিত হয়। তাঁর মতন ব্যক্তির এই প্রকার শিক্ষাদীক্ষায় এবং ঐ প্রকার বেষ্টনীতে যা করা সম্ভব তাই তিনি করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদের গুণ গ্রহণ করলেন, গমকের হুংকার ত্যাগ করলেন এবং বৈচিত্র্য আনলেন। আধার, বাংলাভাষা। তাঁর বৈচিত্র্যসাধনের উপায় একাধিক। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের কাছে শিক্ষানবিশীর কাল তখন উত্তীর্ণ হয়েছে, তিনি আর সুরে কথা বসাচ্ছেন না। রাধিকাপ্রসাদ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজেব গায়ক। রবীন্দ্রনাথ কবিতার উপযুক্ত সুর খুঁজতেন রাধিকাপ্রসাদের কণ্ঠে। তখন তিনি কবি এবং সুরের প্রযোজক মাত্র; অর্থাৎ কথায় সুর বসানোই ছিল তাঁর সমস্যা। এই যুগের তাঁর অনেক রচনা এখনও ওস্তাদের মুখে শোনা যায়। তাঁরা বলেন রবীন্দ্র-সংগীতের আজকাল পতন হয়েছে। তাঁদের মন্তব্য বিচার করলে হয়তো পূর্ব পরিচয়ের আনন্দটুকুই ধরা পড়বে। ‘সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি’ শুদ্ধ ইমনকল্যাণ, অতএব গানটি ভালো— এক্ষেত্রে শুদ্ধতার অর্থ পুনরাবৃত্তি, যথাযোগ্যতা গৌণ— যদিও স্বীকার করি এ যুগে বেশির ভাগ গানেই সুর ছিল কবিতার উপযুক্ত। কিন্তু এ যুগের রচনা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই— কথা ও ভাবের উপযোগী না হলেও

সুরটা যদি সংগীতজ্ঞ শ্রোতার মনে কোনো বিখ্যাত হিন্দুস্থানী গান স্মরণ করাতে সমর্থ হত, যদি সুরটা হুবহু তার নকল হত, তা হলেই শ্রোতা সন্তুষ্ট হতেন। অতএব, কেবল উপযোগিতা দিয়ে রবীন্দ্র-নাথের এই যুগের গানকে যাচাই করা যায় না। করলে পরে তাঁর ক্রমবিকাশকে শ্রদ্ধা দেখানো হয় না। অথচ উপযোগিতাই সংগীত-রচনা ও রচয়িতার মূল্য নির্ধারণ করবে।

উপযোগিতার অর্থ হল এই— কথা ও সুরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাকে স্বীকার করা, তার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটিত করা তদ্‌ভিন্ন কবিতার মূলভাবটির সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত রাগিণীর মূলভাব কিংবা মূর্তির মিলনসাধনকেও উপযোগিতা বলা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কবিতাটি মেঘলাদিনের বর্ণনা, তার মধ্যে মেঘ, বিজলী, ময়ুর, হানা প্রভৃতি গুরুগম্ভীর কথা রয়েছে। আমাদের সংস্কারে মল্লারের সঙ্গে বর্ষার যোগ আছে। এখনও শুনতে পাই, অমুক ওস্তাদ মল্লার গেয়ে শীতকালে বৃষ্টি আনলেন। অতএব কবিতাটির প্রকৃষ্ট মিলন হবে মল্লারের সঙ্গে। কিন্তু এইপ্রকার মিলনসাধনের কোনো সাংগীতিক মূল্য নেই। কথা ও সুরের মধ্যে সম্বন্ধকে প্রকাশ করাই যদি সমস্যা হয় তবে তাদের মধ্যে গোটাকয়েক সন্ধিশর্ত থাকা চাই। সন্ধির শর্ত তৈরি করবার সময় মনে রাখতে হবে বাংলা কবিতার ভাষা, অর্থ ও ছন্দকে, বাংলাদেশের প্রচলিত গায়কী পদ্ধতিকে। সন্ধি কখনও একতরফা ডিক্রি নয়, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানই তার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, প্রত্যেককেই সন্ধির সময় কিছু না কিছু ছাড়তে হয়। ছাড়বার সময় পাবার প্রত্যাশা থাকেই থাকে।

রবীন্দ্র-সংগীতে নেওয়া দেওয়াটা কি ও কতখানি এখন দেখা যাক। ঐ যুগে রবীন্দ্র-সংগীতে পাওয়া গেল সুরের মিশ্রণ, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং আশের আধিক্য। মীড় রয়েই গেল— বিদেশী সংগীতের হারমনিক্‌স্, এবং যন্ত্রসংগীতের অলংকারের পরীক্ষা সফল হল না।

ছাড়া হলো, রাগরাগিণীর ও ব্রজভাষার যতটা শুদ্ধতা তখন ছিল তাকে, এবং সেই সঙ্গে তার পাশে যে সংস্কার গড়ে উঠেছিল তাকেও। সুরের মিশ্রণ সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বললেই চলবে যে, তাঁর প্রদত্ত সুরে গুরুচণ্ডালী দোষ বর্তায় নি। অনেক বড়ো ওস্তাদ এই বিষয়ে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি পাপী। ইমন-বেলাওল, ভৈঁরো-বাহারের গান অনেক বাঙালী যুবক আজকাল গেয়ে থাকেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টির সম্বন্ধে কিছু লিখছি না— অতএব সুর ও কথার সন্ধিশর্তে ফিরে যাওয়া যাক।

বাংলাভাষায় স্বরবর্ণের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সংগীতালোচনার পক্ষে জানা প্রয়োজনীয় সেগুলিকে নিম্নলিখিত মোটামুটি চারটি মন্তব্যে প্রকাশ করা যায়।

১. অর্থপরিবর্তনে স্বরবর্ণের হ্রস্বতায় বা দৈর্ঘ্যে কোনো তারতম্য ঘটে না— যেমন দিন, দিনকাল ও দীনদুঃখী একই উপায়ে উচ্চারিত হয়।

২. যে নিঃশ্বাসটুকু নিয়ে বাক্যারম্ভ করা যায় তার ঝোঁকে যত কথা উচ্চারিত হতে পারে তারাই একটি সমষ্টি হিসাবে বিবেচিত হয়।

৩. বাংলা উচ্চারণের ঝোঁক পড়ে সাধারণতঃ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যের বা বাক্যাংশের প্রথম শব্দে। এ ছাড়া অর্থভেদেও ঝোঁক পড়তে পারে। অন্য কোনো বাধা না থাকলে হসন্তবর্ণের পূর্ববর্ণও ঝোঁক দিয়ে উচ্চারিত হয়।

৪. ক্রিয়াপদ বাদ দিলে বাংলা শব্দ স্বরান্ত নয়, হসন্তান্ত।

ব্রজভাষায়, যে-ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হত তার স্বরবর্ণের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকৃতির। তার স্বরোচ্চারণ রীতিতে অর্থের পরিবর্তনে তারতম্য ঘটে। যেমন দিন ও দীনদয়াল। তার ঐক্য কথাগুচ্ছে আবদ্ধ, শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মে নয়। তাতে উচ্চারণের জোর দেওয়া হয় উপান্ত স্বরবর্ণে।

দুটি ভাষার স্বরবর্ণের ব্যবহারে যদি মোটামুটি ঐ ধরনের পার্থক্য থাকে, তবে রবীন্দ্রনাথের রচিত বাংলা গানে স্বরবর্ণের বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল স্বীকার করতে হবে। অন্ততঃ আ-কারের বেলা তো বটেই। (ধরা যাক্, রাখাল, কিংবা মাতাল কথাটি। ব্রজভাষার নিয়মানুসারে প্রথম স্বরবর্ণ ছোটো হয়ে এবং শেষটি দীর্ঘতর হয়ে রাখাল রাখোয়াল-এ, এবং মাতাল মাতোয়ালায় পরিণত হয়।) বাংলা গানে স্বরবর্ণের স্বাভাবিক সংকোচে ক্ষতি হল তানের, কারণ সাধারণতঃ খেয়ালে প্রথম স্বরবর্ণের আশ্রয়ে তান নেওয়া হয় না, শেষের উপান্ত স্বরবর্ণেই নেওয়া হয়। কিন্তু ধ্রুপদে সে-ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, কারণ তানের ব্যবহার নেই সেখানে। অতএব বাংলায় ধ্রুপদ রচনা অপেক্ষাকৃত সচল— বাংলার স্বাভাবিক গাঢ় সম্বদ্ধতা ততটা মারাত্মক নয় ধ্রুপদে যতটা মারাত্মক বাংলা খেয়ালে। স্বরবর্ণসংকোচের জন্য যে ক্ষতি হয়, বাঙালী গায়ক তার পূরণ করেন 'য়' দিয়ে, যেমন 'মা আমার' কথা-দুটির মধ্যকার অবকাশ অতিক্রান্ত হয় 'মা-য়-আমার' glide-এর দ্বারা।

বাংলা ভাষার breath-group ধ্রুবপদী অলংকারের নিতান্তই অনুকুল; কিন্তু খেয়ালের প্রতিকুল। মীড় ও গমক স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের বিরামের উপযোগী। বাংলাভাষা যেকালে আমাদের মাতৃভাষা, তখন আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথার অর্থ আমাদের মনে আসবেই আসবে। গান যখন কবিতাতেই লেখা হয়, তখন উচ্চারণ স্পষ্ট করতেই হবে। ব্রজভাষার অর্থ আমরা বুঝি না, তাই তার শুদ্ধবাণীর দায়িত্ব বাংলার অপেক্ষা কম। কম বলেই অবশ্য সুর উপভোগের সুবিধা। অতএব একধারে যেমন ক্ষতি, অন্যধারে তেমন সুবিধা। সুতরাং দেখা গেল যে বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েই ধ্রুপদের আড়ষ্টতা কমে যায়, বৈচিত্র্যের অবসর পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ ধ্রুপদাঙ্গের বাংলা গান রচনা করে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারলেন

না। নানা বিষয়ে তিনি গান রচনা করতে লাগলেন, সবগুলি কিছু ধ্রুপদাঙ্গের হতে পারে না। তাঁর রচনায় নানা প্রকারের মনোভাবের, mood-এর প্রকাশ হতে লাগল। এখন সমস্যা উঠল সেইসব বিচিত্র রচনার উপযুক্ত সুর দেওয়া নিয়ে।

এইখানে বাংলা ছন্দের আড়ষ্টতা ও একঘেয়েমি কি ভাবে রবীন্দ্রনাথ ভাঙলেন, তা আমাদের জানতে হবে। পুরাতন ছড়া বাদ দিলে বলা চলে যে বাংলায় পয়ারেরই রাজত্ব ছিল। পয়ার ভাঙলেন ভারতচন্দ্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দিয়ে। তবু বাংলার ঠাসবুনানি হাল্‌কা হল না, কারণ যুগ্মশব্দ গাঁটের মতন। রবীন্দ্রনাথ এসে যুগ্মবর্ণকে দুমাত্রায় ব্যবহার করলেন। এতদিনে বাংলা ছন্দ স্বাধীন হল, কারণ, শব্দের মধ্যকার অবসরটুকু ধ্বনিতে বিস্তারিত হয়ে মাত্রা গোনার দাসত্ব দিলে ঘুচিয়ে। এই অবসরটুকু দীর্ঘ নয়, অতএব তাকে দীর্ঘ তানকর্তব দিয়ে ভরাট করা যায় না, জোর তার মধ্যে আশ ব্যবহার চলে। মীড় ও আশের সাহায্যেই কবিতার রূপ অনেকটা ফুটে উঠতে পারে। যতটা পারে ততটাই এই যুগের রবীন্দ্র-সংগীতের সার্থকতা।

তবু কাব্যছন্দের দাসত্ব গেল না। পরের যুগের কথা ও সুর সমস্তরের। 'তিমির অবগুণ্ঠনে' গানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কথা ও সুরের সন্ধিশর্তগুলি বিজেতা-পরাজিতের নয়, মিত্রমণ্ডলীর। মিত্রও একাধিক, কারণ 'কে তুমি'-তে বিস্ময়-ভাবটিও চমৎকার ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সকল গানেই এইপ্রকার সুর, কথা ও ভাবের অঙ্গাঙ্গি মিলন দেখা যায় বলছি না, কিন্তু বিস্তর রচনায় সম্পূর্ণ মিলনের সাক্ষাৎ পাই। সেইসব রচনাগুলি আমাদের সমস্যাপূরণের সার্থকতার পরিমাণদণ্ড হবে।

অতএব বোঝা গেল, রবীন্দ্র-সংগীতে তান কেন নেই। বাংলা-ভাষায় লেখা সংগীতে তানের সুযোগ কম। লেখক আবার ধ্রুবপদে

অভ্যস্ত। ততটুকু তান সম্ভব যতটুকু সুযোগ breath-group-এর শেষে, অর্থের ইঙ্গিতে এবং ছন্দোবৈচিত্র্যে পাওয়া যায়। তার বেশি তান দিলে রাগিণীর বিকাশ হয়তো হবে, কিন্তু ভাষা, ছন্দ, অর্থ ও সুরের ভারসাম্য নষ্ট হবে— অর্থাৎ সংগীত হবে না। আমার বক্তব্য এই— তানের উদ্দেশ্য আর সংগীতের উদ্দেশ্য এক নয়। তান সুরের একপ্রকার অভিব্যক্তি— সেটি রাগিণীর রূপ-উদ্‌ঘাটনের ইতিহাস; সংগীত হল পরিপূর্ণ সামগ্রী, ইতিহাসের দিকটা তার মুখ্য নয়। তান সুরের একপ্রকার অলংকার, যেটি সুরের ওপর বসাচ্ছেন গায়ক স্বয়ং। সংগীতের অলংকার প্রধানত শ্রোতার মনে। তানে চাই স্বরবর্ণের দীর্ঘ অবসর, সংগীতের অবসর গাওয়ার পর, রেশে। তা ছাড়া, বাংলা সংগীতের বাংলা ছন্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং অর্থ ও ভাবকে অগ্রাহ্য করার অক্ষমতাহেতু তানকে নিতান্তই বশে রাখতে হয়। অর্থসম্ভার সর্বদাই সুরকে চাপা দিতে যাচ্ছে; তাই সংগীতরচয়িতারা সেই গুরুভারকে লঘু করতেই সচেষ্ট হয়েছেন এতদিন। সংগীতে সুরের মিশ্রণ এবং বৈচিত্র্যের সাহায্যে গুরুভারকে লঘু না করে, সহজে বহন করানো— এই হল রবীন্দ্রনাথের একটি কৃতিত্ব।

কথা ও সুর

যাঁরা বাংলা গানকে অবহেলা করেন আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি বাংলা গান ভালোবাসি এবং তার বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা সমগুণাত্মক নয়। ভালোবাসি রক্তের টানে, শ্রদ্ধা করি নানা কারণে। বাংলা গান যদি না ভালোবাসতাম তবে শ্রদ্ধার দিক ও তার গুরুত্ব পরিবর্তিত হত। যদি না শ্রদ্ধা করতাম, কেবল ভালোই বাসতাম, তবে আমার প্রাদেশিকতাই প্রমাণ পেত। ভালোবাসা দেখানো মনের অসংযম, অতএব প্রবন্ধের বিষয় নয়। চিঠির হতে পারে। আমি শ্রদ্ধারই কারণ দেখাব।

ব্যক্তিগত রুচি বাদ দিলে দেখতে পাই যে সংগীত প্রভৃতি কারু-কলা জীবনীশক্তির উদ্বর্ত অংশের প্রক্রিয়া। জীবনে প্রাচুর্য এলেই অতিরেকাংশের সাক্ষাৎ মেলে, নচেৎ জীবনযাত্রানির্বাহেই শক্তিতে টান পড়ে। অতএব বর্ধিত শক্তির বিভাগের ওপরই কতটা অংশ আনন্দ-উপকরণের সহায়ক হবে তা নির্ভর করছে। সমাজের ওপর নতুন কোনো ধাক্কা এলে, সংঘর্ষের ফলে, নতুন শক্তি জন্মায়, তাই প্রথম প্রথম সংগীতেরও উন্নতি হয়। অবশ্য সমাজ যদি জীবন্ত হয়, যদি ধাক্কা হজম করতে পারে তবেই হবে। সমাজশক্তিতে ভাঁটা পড়লে, উদ্দীপনার শক্তি দুর্বল হলে আনন্দের মূলধনে টান পড়ে। তখনই বাড়ে শুচিবাইয়ের প্রকোপ। ভারতের মধ্যযুগের শেষভাগে মুসলমান আমলে ভক্তির বন্যা, যে কারণেই হোক— বোধহয় ক্ষতিপূরণের জন্যই ডেকেছিল। তাই লোকসংগীতের প্রসার হোলো যথেষ্ট। তারই ফলে, তারই তাগিদে ধ্রুবপদ্ধতির উন্নতি। ইংরেজ আমলের গোড়ায় কাকজ্যোৎস্না দেখে কোকিল ডেকে ওঠে। কিন্তু অতি শীঘ্রই বুঝলাম যে সেটি সুপ্রভাত নয়। বিদেশী সভ্যতার

প্রকৃতি যেদিন বুঝলাম সেইদিন আমরা রসের খেতে আল দিলাম। সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা চালানোই যখন একমাত্র কাম্য হয় তখন কোনো কারুকলা প্রাণের বস্তু থাকতে পারে না, শৌখিন দ্রব্যে পরিণত হয়; যেমন মুঘল দরবারে হয়েছিল। সংগীতে অবশ্য ঐ প্রকার সার্থক জীবনের ছোঁয়াচ লাগতে দেরি হওয়াই স্বাভাবিক —তবু লাগে। বাইরের চাপে, জীবনের অল্পতার সংকোচনে সংগীত হয় 'বিশুদ্ধ', অব্যবহারিক জীবনের প্রতীক, অন্য আর্টের আদর্শস্থল। এইপ্রকার মতবাদ য়ুরোপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রচলিত হয়। আমাদের দেশেও সংগীতে গোঁড়ামি শুরু হলো মাত্র পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে।

এই গোঁড়ামিকে ঘৃণা করতে পারি না— তার মধ্যে বুদ্ধির চর্চা, চরিত্রের দৃঢ়তা, আভিজাত্যবোধের দম্ভ আছে। ভট্টপল্লীর স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে, যোগাযোগের মধুসূদনকে যে কারণে শ্রদ্ধা করি সেই কারণেই ধ্রুবপদ্ধতির গোঁড়ামিকেও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এই তর্ক-বুদ্ধির সীমা নির্দিষ্ট, এই দৃঢ়তা পরিবর্তনশীল, সংস্কারাশ্রিত, এই আভিজাত্যবোধ অনৈতিহাসিক, অসামাজিক, জীবনপ্রগতির প্রতিকূল। এখন সে রাম নেই, সে অযোধ্যাও নেই— আর নেই বশিষ্ঠদেব— বালখিল্যেরও খাতির খানিকটা কমেছে। এখন সব শ্রীক্ষেত্র— তাই বলে দুঃখ করলে চলবে না, ভাঙনের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ রয়েছে— তারই ওপর রসানুভূতির যুগোপযোগী মত খাড়া করতে হবে। এখন কোনো রসস্রষ্টাই গ্রামের বৃদ্ধাপিসীর মতো 'এই আমাকে ছুঁসনি' বলে আলগোছে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে পারবেন না। তথাকথিত অন্তর্জনিষ্ণু কিংবা স্বনিষিক্ত শুদ্ধতা এখন বন্ধ্যাত্বের নামান্তর, বহির্জনিষ্ণুতাই এখনকার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত। সংগীতের ইতিহাস সামাজিক জীবনের গূঢ় নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। আমি প্রতিভার বিশেষ দান অস্বীকার করছি না। প্রতিভার

জোরে ধ্রুবপদ্ধতি হয়তো আরো কয়েকদিন চলবে। কিন্তু দিব্য-শক্তিসম্পন্ন কলাবিদের সংখ্যা কমেছে। কেবল তাই নয়, সংখ্যাহ্রাস অপেক্ষা প্রতিভাশালী নায়কবৃন্দের নিজেদের অবদানের সসীমতাই এখন চোখে পড়ে। মিয়াঁ তানসেনের মল্লার যে আজও বেঁচে আছে আর চর্জু কি ধোঁন্দি মল্লার লোপ পেতে বসেছে তার কারণ কি? সংগীতের রূপ পরিবর্তন করেন হয়তো দু'একজন বড়ো ওস্তাদ— কিন্তু তাঁদের প্রবর্তিত রূপের মধ্যে কোনটি বেঁচে থাকবে আর কোনটি মরবে নির্ভর করেছে সামাজিক প্রক্রিয়ার ইতিহাসের ওপর। মাত্র-সংগীতের দিক থেকে নতুনরূপের ভালোমন্দ বিচার খানিকটা চলে, বাকিটা অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি। মাত্র-সংগীত বোধ করি প্রত্যয় মাত্র। তার রসোপভোগের জন্যে যে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন সেটি কোনো ব্যক্তি অর্জন করতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। পণ্ডিতবর্গের মুখে শুনেছি যে আমাদের আলংকারিকরা অনিবদ্ধ সংগীতে কোনো রস খুঁজে পাননি। লোচনের মতে* নিবদ্ধ সংগীত, অর্থাৎ বর্ণ তান মান লয় ছন্দপ্রধান গীতেরই রস আছে।

বাংলা গান নিবদ্ধ সংগীতের মধ্যে পড়ে। তান মান ছন্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। সাধারণভাবে ভাষার আলোচনা করব। আমার বক্তব্যের যুক্তিবিন্যাস গোড়ায় বলে রাখি। ভাষার সঙ্গে সুরের গরমিল ও মিল কোথায় প্রথমে বিচার করব, তার পর কবিতার উপযোগী সুর কি ভাবে বসান যায় তার আলোচনা করব। অবশেষে সংস্কারগত সুরপদ্ধতির এবং বাংলা ভাষার প্রকৃতির গোটা

* 'নিবদ্ধমনিবদ্ধং চ গীতং দ্বিবিধমুচ্যতে
অনিবদ্ধং ভবেদ্গীতম্ বর্ণাদি নিয়মৈর্বিনা
যথা গমকধাত্বংগ বর্ণাদি নিয়মৈর্বিনা
নিবদ্ধং চ ভবেদ্গীতম্ তালমানরসাঞ্চিতম্
ছন্দোগমকধাত্বংগ বর্ণাদি নিয়মৈঃ কৃতম্'

কয়েক মূলতত্ত্বের নির্দেশ থাকবে। আমার উদ্দেশ্য বাংলাকথা ও হিন্দুস্থানী সুরপদ্ধতির যোগাযোগের নিয়মের ইঙ্গিত দেওয়া।

প্রথমে আমি যন্ত্রসংগীতের উল্লেখ করছি, কারণ, এক হিসেবে যন্ত্রসংগীতই বিশুদ্ধ ও কুলীন। চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া তর্কের সনাতন রীতি, অতএব যন্ত্রসংগীতের সাহায্যে সুর ও ভাষার পার্থক্য ধরা পড়বে। সাহিত্যের ভাষা যেমন একপ্রকার ভাবের অভিব্যক্তির উপায়, বাহন ও বর্ধক, তেমনি সুরও অন্য একপ্রকার ভাবের অভিব্যক্তির উপায়, বাহন ও বর্ধক। যে ভাববস্তু সাহিত্যের উপকরণ, সে ভাববস্তু যন্ত্রসংগীতের উপকরণ নয়। সাহিত্যে, ষড়রিপুর সাক্ষাৎভাবে আশ্রিত মনোভাব ফুটে ওঠে; যেমন ধরা যাক কবিতা পড়লে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য কিংবা তাদের কোনো সূক্ষ্মপ্রকারভেদ সহজেই পাঠকপাঠিকার মনে জাগ্রত হয়। ভারতীয় যন্ত্রসংগীতে তা হয় না। (ভারতীয় বললাম এইজন্যে যে টলস্টয়ের Kreutzer Sonata নামক বিখ্যাত গল্পটি আমি ভুলতে পারি না— এবং ড্রাইডেনের আলেকজান্দারের স্বপ্ন নামক কবিতাও পড়েছি। লোকমুখে শুনেছি যে টলস্টয়ের সংগীত-জ্ঞানের মধ্যে ততটাই ধর্মবুদ্ধি ছিল যতটা বীরত্ববোধ ছিল আলেকজান্দারের সংগীতজ্ঞানে। তা ছাড়া— বিদেশী সংগীত সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে চাই না।) তবু বিদেশে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে কোনো স্বরের অন্ততঃ অন্তর্নিষ্ঠ ক্ষমতা নেই করুণা কিংবা ক্রোধ উদ্রেক করবার। পরীক্ষা যেকালে স্বর নিয়ে, স্বরবিন্যাস নিয়ে নয়, তখন স্বদেশী বিদেশী সংগীতের তর্ক উঠতেই পারে না। ওঁদের minor third আমাদের কোমল গান্ধার। যাঁরা দরবারী কানাড়া কি বস্তু জানেন না, সে সম্বন্ধে গল্প পর্যন্ত শোনেন নি এমন উচ্চশিক্ষিতদের নিয়ে একবার পরীক্ষা করা হয়। প্রথমে আলাপ, পরে গৎ, ধীরে ও দ্রুতে বাজানো হল, কেউ কেউ বললেন কান্নার আওয়াজ, দুচারজন

সমুদ্রের গর্জন, অনেকে আবার ঘুঙুরের ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। এঁদের সুরানুভূতি অপেক্ষা স্মৃতির সহচরীশক্তিই ছিল জোরালো। আমি তাঁদের দোষ দিচ্ছি না, তাঁদের মনে একই সুরের দ্বারা উদ্দীপিত মনোভাবের বৈচিত্র্য উল্লেখ করছি। একই সাহিত্যিক রচনা শুনলে অ-সাহিত্যিকদের মনেও অত বিভিন্নভাব উৎপন্ন হয় না। সেইজন্য বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় সাহিত্যের ও সংগীতের আবেদন ভিন্ন আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া চাই। যন্ত্রসংগীতের উপাদান, গঠন, উপভোগ সাহিত্যের উপাদান, গঠন ও উপভোগের সমশ্রেণী নয়।

এই ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বুঝতে হবে। আমরা জানি যে মনে কোনোপ্রকার আঘাত পড়লে গোটাকয়েক প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। তাই দিয়েই আমরা ব্যাপারটা কি বুঝি এবং প্রতিবিম্বগুলির (প্রতিমা, প্রতিরূপ) সাধারণ গুণের সাহায্যে পরকে বোঝাই। প্রতিবিম্ব মোটামুটি দুইপ্রকারের— বস্তুগত ও কথাগত। মনোবিজ্ঞানে এতদিন এদেরই আলোচনা হয়েছে। অবশ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিংবা আশ্রয়েই প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। আমাদের ধারণা ছিল যে ইন্দ্রিয়গুলি সকলের সমানভাবে প্রবল নয়। বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যের জন্যই ভাবতাম কোনো আর্টিস্ট হবেন গাইয়ে, কেউ বা হবেন পটুয়া, কেউ ভাস্কর, কেউ সাহিত্যিক। অর্থাৎ, কথাগত প্রতিমার আধিক্যে সাহিত্য, বস্তুগত প্রতিমার আধিক্যে চিত্রকর প্রভৃতি। পরে টের পাওয়া গেল যে ব্যাখ্যাটা অত সোজা নয়। আজকাল পরীক্ষার দ্বারা বুঝেছি যে কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়-প্রাবল্যের সঙ্গে প্রতিরূপ বিন্যাসের সম্বন্ধ কার্যকারণের মতো সরল নয়। সম্বন্ধের নিগূঢ়তা সম্বন্ধেও আজকাল বৈজ্ঞানিকরা সন্দেহ পোষণ করছেন। আমরা জানি যে ব্যবহারিক জগতেই এমন সব ঘটনা ঘটে, এমন অভিজ্ঞতা আসে যার কোনো প্রকার কথাগত ও বস্তুগত প্রতিরূপ তৎক্ষণাৎ মনের উপর জেগে ওঠে না। আমরা এও জানি,

এমন সব কথা কিংবা অভিজ্ঞতা আছে যাদের প্রতিমা তৎক্ষণাৎ ভেসে ওঠে বটে কিন্তু তার পরে সে সম্বন্ধে একটামাত্র সাধারণ বোধই রয়ে যায়। (হিন্দু বৈয়াকরণরাও বহুপূর্বে এ কথাটি জানতেন।) ধরা যাক, অতি পরিচিত ফুল কথাটি— 'ফুল' শব্দটি উচ্চারণ করলেই, গোলাপ, বেল, চামেলি একটা না একটা ফুলের চেহারা অনেকেরই মনে ওঠে, কিংবা হয়তো মুগল চিত্রের কোনো বাদশাহ কি বাদশাজাদীর হাতের ফুল, না হয় বড়োদিনের উৎসবে খ্রীস্টান পরিবারে গাঁদাফুলের মালা, না হয় কারুর গলার মালার একটি ফুল। কিন্তু এইপ্রকার কথাগত ও বস্তুগত প্রতিরূপের অতিরিক্ত অন্য একটি অনুভূতি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ঐ কথারই মধ্যে আছে— সেটি সাধারণ, অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটি ফুল নয়, কোনো বিশেষ মুখের উচ্চারিত ফুলও নয়, কোনো ব্যক্তির হাতের কি গলার ফুলও নয়। তাকে ফুলের ফুলত্ব বলা চলে। (এই অনুভূতি কারুর মতে গোড়ায়, কারুর মতে শেষে জন্মায়— সে তর্ক এখানে অবান্তর।) ফুলের অনুভূতি কিন্তু সকলেরই মতে ফুলের বস্তুগত কিংবা কথাগত প্রতিবিম্বের দু'ধাপ দূরে, নীচে কি ওপরে সে তর্ক করেও লাভ নেই। কিন্তু তারা যে একজাতের নয়, এ সম্বন্ধে দুই মত নেই বোধহয়। পূর্বোক্ত সাধারণ বোধের কোনো স্পষ্ট আকার নেই, যেমন প্রতিবিম্বের থাকে। সেটি অন্যজাতের কি অন্যস্তরের বলেই তাকে ভাষায় কিংবা চিত্রে যথার্থ ব্যক্ত করা যায় না। জোর তার অনুবাদ চলে, ভাষায় কিংবা চিত্রে, সাধারণ থেকে বিশেষে এনে। (এইটুকুই হলো রাগরাগিণীর চিত্রের প্রকৃত সার্থকতা।) ব্যবহারিক জীবনে এইপ্রকার সাধারণ অভিজ্ঞতার অবিশেষ ও অস্পষ্ট অনুভূতি নিতান্ত কম, তাই তার প্রয়োগ কথিত ভাষায় স্বল্প, কারণ চলতি ভাষা সকলের ব্যবহারের উপযোগী হওয়া চাই। নব্য মনোবিজ্ঞানে এই অনুভূতির একটা জার্মান প্রতিশব্দ

দেওয়া হয়—যার ইংরেজি awareness, যেটি cognition থেকে পৃথক।

আমার বক্তব্য এই— বিশুদ্ধ সংগীতের (যেমন যন্ত্রসংগীতের) উপকরণ কিংবা মূল বিষয় হলো কথাগত ও বস্তুগত প্রতিবিম্বের অতিরিক্ত অন্য একপ্রকার পূর্বোক্ত অ-ব্যবহারিক, অস্পষ্ট, অ-বিশেষ অনুভূতি। যখন কোনো ব্যক্তির মনে ঐ ধরনের অনুভূতি জন্মায় এবং প্রকাশ করবার তাগিদ আসে তখন সে ব্যক্তি তাকে সুরে রূপ দিতে বাধ্য; অন্তত সুরে রূপায়িত হলেই ঐ অনুভূতি প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে। (অন্তত বললাম এইজন্য যে অনেক অনুভূতি অনির্বচনীয় হতে পারে, যেমন যোগীরা বলেন।) অতএব, রসিক শ্রোতার মনেও তার ইঙ্গিত দেওয়াই সুরস্রষ্টার ধর্ম। আবার বলি, যে অনুভূতি সুরের প্রেরণা, যাকে রূপায়িত করাই সুরস্রষ্টার প্রধান কাজ সেটি ব্যবহারিক জীবনের ভাবগুলির তুলনায় অস্পষ্ট হতে বাধ্য, কারণ ব্যবহারিক জীবনের ভাবগুলি জীবনযাত্রার উপযোগী কাজে পরিণত হয় এবং সংগীতের অনুভূতি কোথায় যেন আটকে থাকে। সাহিত্যে তবু তার কর্মপরিণতি আছে কিন্তু সংগীতে মোটেই নেই। কিন্তু অত অস্পষ্ট ও অ-ব্যবহারিক ও অকর্মণ্য বলেই যে সে রূপাতীত তা নয়। তারও প্রতিমা সম্ভব। যে অভিজ্ঞতা অমন সূক্ষ্ম ও সাধারণ বোধের (awareness) ওপর প্রতিষ্ঠিত তার উপযুক্ত ভাষাও সূক্ষ্ম হতে বাধ্য। সেই ভাষার নাম সুর, তার অক্ষর স্বর, তার বিন্যাস লয়, তাল ইত্যাদি। সুর হলো imageless awareness-এর নতুন রূপ এবং উপযুক্ত প্রতিমা। এই হলো সুরের সঙ্গে সাহিত্যের ভাষাগত প্রাথমিক পার্থক্য।

তর্কের খাতিরে কেবল নয়, সত্যের তাগিদেও বিশুদ্ধ সংগীতকে (যেমন যন্ত্রসংগীতকে) ব্যবহারিক জগৎ ও বাঙ্ময় জগৎ থেকে পৃথক রাখতে হলো। কিন্তু সেই সত্যের খাতিরেই মিলগুলি দেখাতে

হবে— তবেই আমরা বাংলাগানের এবং নতুন চালের বাংলা সংগীত-রচনার মূল্য নির্ধারণ করতে পারব। সর্বপ্রকার অনুভূতির পার্থক্য ও শ্রেণীভেদের মূলে রয়েছে সেই মানুষ, তার ভাবধারা, তার প্রকাশেচ্ছা এবং সেই মানুষের মতন মানুষের মনের ওপর প্রতিক্রিয়া, ফলাফল। আর্টিস্টকে বিশিষ্ট জীবনমাত্র ভেবে আর্ট সংক্রান্ত মতবাদ খাড়া করলে সেটি অচিরে ধূলিসাৎ হয়। যদি কোনো ভদ্রলোকের দোতলা বাড়ি থাকে তবে তার পক্ষে যে-কোনো তলায় অন্তরীণবাস সুস্থ ও সহজ অবস্থায় অসম্ভব ; কারণ বাড়ি তার নিজের, স্বাধীন ও সুস্থ মানুষ সে, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত কিংবা নতিপুতির চিৎকারে বিধ্বস্তও নয়, ভদ্রলোক সারা দিনরাত পুজোও করে না— কোনো খেয়ালে সে ওপর তলায় থাকবে, কোনো ঋতুতে সে নীচে নামবে, তার মরজিকে বাদ দেওয়া যায় না। সুরস্রষ্টা ও রসিক শ্রোতা উভয়কেই এইভাবে দেখতে হবে। যে রসতাত্ত্বিক মানুষকে বাদ দিয়ে রস বিচার করে তার নিজের অনুভূতিই অসম্পূর্ণ। সোজা কথা এই— একই মানুষ কথা কয়, কাজ করে, গান গায়, গান শোনে। কথাগত, বস্তুগত, সুরগত অনুভূতি একই মানুষের সম্পদ ও স্বভাব। জীবনটা বিশ্ববিদ্যালয় নয় যে বিশেষজ্ঞ হলেই মূর্খ ও অন্ধ হতে হবে। অতএব মানুষ যেকালে একটি আস্ত, গোটা জীব, তখন তার কোনো বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে গেলে তার অখণ্ডত্বকে, শাস্ত্রের ভাষায়, তার বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাবকে একত্রে ধরতে হবে। এই হলো প্রথম যোগ, সুরের সঙ্গে কথার, অর্থাৎ মানুষের দিক থেকে।

সুরানুভূতির উপযুক্ত প্রতিমা স্বরবিন্যাস— কথাও নয়, চিত্রও নয়, পূর্বে বলেছি। সেই সঙ্গে আরো বলেছি যে কোনো কোনো কথার মধ্যেই কথা ও বস্তুগত প্রতিবিম্বকে অতিক্রম করবার শক্তি রয়েছে। অবশ্য কম বেশি আছে— এবং সেটি নির্ভর করেছে কথার

ভাষানুষঙ্গ এবং বিন্যাসের মধ্যে তার বিশেষ অবস্থিতির ওপর। বিন্যাস, ছন্দ প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। সহচারী, অনুষঙ্গ আসক্ত ভাবেরই উল্লেখ করছি, ইংরেজিতে যাকে association বলা হয়। ঐ 'ফুল' কথাটিই ধরা যাক— ধীরাজের একখানি বিখ্যাত বসন্তের ধামার বাংলায় খুব প্রচলিত — ভ্রমরা ফুলি বনোয়ারী ইত্যাদি। এই গানের 'ফুল' কথাটি চামেলী বেলী চম্পা নয়— এর নাম নেই, গন্ধ নেই, এর রূপ নি সা ঋ সা নি ধা ম্ধা—কি ঐ ধরনের একটা স্বরবিন্যাস। কিন্তু উচ্চারণের বেলা সেটি ফুলি— অন্য কিছু নয়, এবং হিন্দুস্থানী কিংবা বাংলা যে ভাবেই উচ্চারণ করাই যাক না কেন, শব্দটি শুনে ফুল ভিন্ন ফলের কথা মনে হবেই না। আমার বক্তব্য হলো এই— ঐ ললিতাঙ্গের বসন্তরাগের নিতান্ত পরিচিত গানে 'ফুলি' শব্দটি থাকার দরুন এবং বসন্ত ঋতুতে ফুলের বাহার হয় এই সাধারণ অভিজ্ঞতার জন্য কোনো নতুন কবিতায় যদি 'ফুল' কথাটি প্রথমেই থাকে এবং সেই কবিতাকে যদি সুরে বসাতে হয় তবে তাকে বসন্তরাগেই বসাতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। শ্রোতা যদি গানটি জানেন তখন তিনিও সম্ভবত কবিতাটিতে ললিতাঙ্গের বসন্তরাগ প্রত্যাশা করবেন। স্রষ্টার রচনা এবং শ্রোতার প্রতীক্ষা— দু'এর মিলনে গানটি সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। তবেই দেখা গেল যে মানুষের স্মরণশক্তি এবং পূর্বপরিচয় থাকার জন্য সুরস্রষ্টা তাঁর অস্পষ্ট অনুভূতিকে রূপ দেবার সময় যথাযথ কথাকে আশ্রয় ও গ্রহণ করলে রসসৃষ্টির কোনো বাধা ঘটে না। অন্তত শ্রোতার পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। অর্থাৎ কথার সাংগীতিক আভাসকে গায়ককে শ্রদ্ধা করতেই হবে।

যথাযথ কথা সম্বন্ধে আরেকটি মন্তব্য করতে চাই। কোনো কথার ব্যবহারিক অর্থ যদি সুস্পষ্টভাবে কোনো বস্তুর কিংবা অন্য কোনো শব্দসমাবেশের প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তোলে তবে স্বভাবতই সে

কথা গানে অচল হবে, কারণ ঐ ধরনের প্রতিবিম্বকে অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ সমস্যা। সেইজন্যই বোধহয় শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতায় দুর্বোধ্য কথার বদলে পুরাতন ও পরিচিত কথারই প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে শ্রোতার দাবী খুব বেশি।

কারণ, শ্রোতা পৃথিবীতে থাকবেই, এবং শ্রোতার আর রচয়িতার রসাভিজ্ঞতার মিলন ভিন্ন রস জন্মায় না। অতএব শ্রোতার অভিজ্ঞতা প্রাথমিক না হলেও (হঠাৎ বড়োলোকের বাড়িতে কিন্তু প্রাথমিক) তাকে স্বীকার করতেই হবে ; অতএব তার মনে সুরস্রষ্টার প্রাথমিক অনুভূতি উৎপন্ন ও বহন করবার জন্য তারই সুবিধানুযায়ী কিছু না কিছু রফা করা চাই। আসরে গায়ক-বাদক একজন কি দুজন, শ্রোতা অনেক। অতএব নানাধরনের (ভদ্র) শ্রোতা থাকতে বাধ্য— তাদের মানসিক প্রকৃতির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বোধগম্য যে শব্দ তাকেই আশ্রয় করতে হবে— তবেই সুরের ধর্ম ক্ষুণ্ণ হবে না। মজা এই যে ঐ ধরনের কথার আর কোনো বিশেষ বস্তুগত প্রতিবিম্ব থাকে না। কানুহাইয়ার হাতে তখন বাঁশি থাকে না, মাথার চূড়াও উড়ে যায়— থাকে তখন স্বরবর্ণের সাজ, যার ওপর তানের ঝলক খোলে ভালো। তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'কোথা বাইরে দূরে যায়রে উড়ে' গানটির প্রত্যেক শব্দটি কোনো প্রতিরূপ সৃষ্টি করে না, শ্রোতাকে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত করে না। শ্রোতা যদি গানটি শুনে চুপ করে বসে থাকেন তবে সেটা মানুষ যে চিড়িয়া নয় ভেবে নয়।

এতক্ষণ আমি 'কথার' কথা কয়েছি। কিন্তু কবিতা কেবল পর পর কথার গোছা নয়। আমি আমার যুক্তির সূত্রটি আবার ধরিয়ে দিচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য সুরের এবং কথার মিলনক্ষেত্রটি জরিপ করা, পূর্বে গরমিল কোথায় দেখিয়েছি। আমি গন্ধ বাদ দিলাম— যদিও তার ঝংকার আছে এবং আবৃত্তির সময় সেটি মেনে চলতে হয়।

দীর্ঘ কবিতার, চারণ-গানের, লোকসংগীতের, গজলের অনেকাংশ সুরে আবৃত্তি করা হয়। আমি সে অংশগুলিকেও ধরছি না। আমার বিষয় গীতিকবিতা, বিশেষ করে নতুন ধরনের বাংলা গীতিকবিতা। কবিতার কথা নিয়ে আলোচনা করেছি, এবার তার অন্য দিকটা দেখব। আমরা অনেকেই এমন একাধিক কবিতার সঙ্গে পরিচিত যার অর্থ গদ্যের বাক্যে পরিণত করা যায় না। চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়, হায়রে হায়, বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায়রে হায়— গানটি আবার স্মরণ করুন। মরমী কবিতা প্রায় সবই ঐ ধরনের। সুরের রেশ ধরে মরমী কবি গুহ্য জগতে প্রবেশ করেন। বিদেশী সিম্‌বলিস্ট কবিদের অন্য কোনো রাজ্যে যাবার প্রয়োজন নেই— প্রতিমা সাজানই তাঁদের মতে কবির একমাত্র উপযোগী কাজ। কিন্তু তাঁদের প্রতিমাগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়, নিতান্ত ব্যক্তিগত ও অব্যবহারিক ও অনাবশ্যক। তাই কোনো সিম্‌বলিস্ট কবিতার গদ্যে সারার্থপ্রকাশ অসম্ভব। একাধিক সমালোচকের মতে, সুরের দিকে ঝোঁকের এবং গদ্যের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে পরিণত হবার অক্ষমতার মাত্রাই কবিতার সার্থকতা প্রতিপন্ন করে। ঐ মন্তব্যের সারাংশ হলো এই : কবিতার শব্দবিন্যাস চিন্তাধারাকে তর্কযুক্তির অপর পারে নিয়ে যায়, বস্তুর এবং ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনীয় ভাববস্তুর অন্য কিনারে ; তখন বস্তুগত প্রতিবিম্ব লোপ পায় বলা চলে— কিন্তু শব্দগত প্রতিবিম্ব লোপ পায় না, কারণ শব্দের দুটি ইঙ্গিত আছে— একটি অর্থ, অন্যটি শব্দগত ব্যঞ্জনা। যে সুরস্রষ্টা কবিতায় সুর বসাচ্ছেন তিনি ব্যঞ্জনাকেই প্রকট করবেন। কিন্তু কবিতার অর্থ তখনও একেবারে লুপ্ত হচ্ছে না, সুর বসাবার মুহূর্তে হয়তো লোপ পাচ্ছে— কিন্তু তার পূর্বে নয়, এবং অন্তত গানটি শোনবার সময় শ্রোতার মনেও পুরোপুরি নয়। অর্থ তখন উহ্য, লুকিয়ে রয়েছে। যেই শ্রোতাকে গানটি কেমন লাগল, এবং

রচয়িতাকে, এই কবিতায় ঐ সুরটিই বসানো হলো কেন প্রশ্ন করা হয় তখন উভয় সুররসিককে অর্থের উপযোগিতার উল্লেখ করতে হয়। তবু সেটা হয়তো সুরগত উপযোগিতা না-ও হতে পারে। তাই শব্দের বেলা যেমন বলছি তেমনই কবিতার বেলাতেও বলি; যে শব্দ যত পরিমাণে অর্থ কিংবা বস্তুকে অতিক্রম করবার শক্তি ধারণ করে সেই শব্দ তত পরিমাণে গীতে সহায়ক, এবং সেইপ্রকার শব্দবাহী, শব্দবিন্যস্ত কবিতাই ততটা পরিমাণে সুররচনার উপযুক্ত বাহন।

তবুও কবিতা হলো না। কবিতা শব্দ, শব্দবিন্যাস ছাড়া আরো কিছু থাকা চাই— তার সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ কি? প্রত্যেক কবিতায়, বিশেষত গীতিকবিতায় একটি মূলভাব থাকে। আলংকারিকরা তাকে স্থায়ীভাব বলেছেন। কারণ, যখন কার্য ও সহকারী সম্বন্ধ, আলম্বন ও আধার এই দুই বিভাব, এবং অনুভাব ও ব্যভিচারীভাবে সাহিত্যে প্রকট হয় এবং যখন তারা কোনো স্থায়ী ভাবকে আশ্রয় করে তখনই, কাব্যপ্রকাশের মতে, রসের উদ্ভব হয়। একটি কবিতায় স্থায়ীভাব সাধারণত একটি, তবে একাধিকও সম্ভব। (ইংরেজি ভাষায় যেমন mood-এর মধ্যে একাধিক feeling থাকতে পারে। Temper, অর্থাৎ মেজাজ ক্রিয়াপদ্ধতির কথা। রসবিচারে এই তিনটি বিভাগ মানতেই হয়।) সাহিত্যের সব স্থায়ীভাবকে সুরে প্রকাশ করা যায় না, অন্তত উচিত নয় মনে হয়। হিন্দুস্থানী সংগীত-পদ্ধতি দেখে মোটামুটি বলা চলে যে তথ্য কি তত্ত্বপূর্ণ কবিতা উৎকৃষ্ট হলেও হিন্দুস্থানী ঢঙের তানকর্তব পূর্ণ খেয়ালে অচল। ধ্রুপদে হয়তো চলতে পারে। (মিস্টিক্ কবিতার ইঙ্গিত করছি না।) দার্শনিক কবিতার প্রতিপাদ্যটি মূলভাব ও প্রকৃতির অপেক্ষা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কবিতা বুঝতেই যদি বেগ পেতে হয় তবে সেটা উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হতে পারে না। তেমনই কবিতা শুনেই যদি তৎক্ষণাৎ কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয়, তার মধ্যে যদি

উপদেশ থাকে, (শেষের সেদিন করুরে স্মরণ), কিংবা সেটি যদি জ্ঞাতব্য বিষয়ে ভারাক্রান্ত হয় তবে তাকে আবৃত্তি করাই ভালো। কর্মপ্রবৃত্তির প্রতিরূপগুলি বস্তুগত, তর্কপ্রবৃত্তির প্রতিরূপগুলি কথাগতই হয়ে থাকে। গীতিকবিতার অর্থ বোঝবার তাড়া নেই, কাজ করবার হুকুমও নেই। আছে খেয়াল, খামখেয়াল, যেটি গম্ভীর হলেও চলবে— কিন্তু সুগভীর চিন্তাধারা হলে চলবে না, হাল্‌কা হলেও চলবে কিন্তু তার উত্তেজনায় নেচে উঠলে চলবে না। বিশুদ্ধ বাংলাতে বলি— থাকবে mood, proposition নয়, incentive to action কিংবা line of conduct-ও নয়। পদকর্তাদের অনেক পদই আধ্যাত্মিক, কিন্তু কীর্তনিয়া ঠাকুর মূলভাবকে— যেমন মান, বিরহ প্রভৃতিকে অগ্রাহ্য করে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পদও যদি গান তবু সংগীতরস সৃষ্টি করতে পারেন না। ঠিক এই কারণেই লোক-সংগীতের ভাষা সহজ, সুরও তাই সহজ। ঠুংরিতেও এইপ্রকার স্থায়ীভাব আছে— তাদের নায়িকা বলে। অতুলপ্রসাদের কবিতা দর্শনের দিক থেকে বুদ্ধিকে সদাজাগ্রত নাও রাখতে পারে, কিন্তু তাঁর প্রত্যেক রচনা এক-একটি খেয়াল-প্রসূত— তাই সুরগত রূপের অভাবে অপূর্ণ। তাঁর কোনো কবিতাই স্বাবলম্বী নয়, মনে হয়। চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে? এর মধ্যে তত্ত্ব নেই— কেবল তাই নয়— প্রশ্নটির সমাধানের ওপর— কিংবা তিনি এলে তাঁকে অভিনন্দন ও সমুচিত অভ্যর্থনার ওপর গানটির সার্থকতা নির্ভর করছে কি? সুরের জন্যই এই গীতিকবিতাটি যেন প্রতীক্ষা করছে, কোনো মহিলার জন্য নয়।

আমার বক্তব্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ জয়দেবের একটি পদ উদ্ধার করছি।*

* আমার একটি ছাত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর পন্ত এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে লক্ষ্ণৌ

বিরচিত চাটুবচনরচনম্ চরণরচিত প্রণিপাতম্
সম্প্রতি মঞ্জুল বঞ্জুল সীমণি কেলিশয়নমনুয়াতম্।
মুগ্ধে মধু মথনমনুগতমনুসর রাধিকে।

সখী রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে উত্তেজিত করছেন। এই পদের ছন্দলালিত্য, শব্দের ঝংকার কেবল রাধিকা কেন সকল শ্রোতারই মন হরণ করে। কিন্তু উপদেশ হিসাবে এই পদ অগ্রাহ্য (এমন-কি অন্যায় অর্থাৎ অহিন্দু)— প্রধান কারণ, তার লালিত্য উপভোগে কর্মপ্রবৃত্তি হত হয়। জয়দেব বসন্তরাগে পদটিকে গাইতে অনুরোধ করেছেন— তাল দিয়েছেন ঝাঁপ। ওধারে রত্নাকরে কি আছে শুনুন,

বসন্তে প্রহরে তুর্য্যে মকরধ্বজ বল্লভঃ
সম্ভোগ বিনিয়োক্তব্য বসন্তঃ তৎসমুদ্ভবঃ।

অর্থাৎ গ্রন্থকার (সংস্কৃত যখন তখন ঋষি) শৃঙ্গার নামক স্থায়ীভাবের সম্ভোগাংশে বসন্তরাগকেই উপযুক্ত বলেছেন। (দেখা যাচ্ছে স্থায়ীভাবেরও প্রকারভেদ স্বীকৃত হয়েছে।) শৃঙ্গারের অন্য প্রকারে শার্ঙ্গদেব বরাটি ও গুর্জরী অনুমোদন করেছেন। সেই অনুসারে বোধহয় জয়দেবও অন্যপদে বরাটি ও গুর্জরী বসিয়েছেন। আলংকারিকরা সাধারণত সাহিত্যেরসেরই রসিক ছিলেন, কিন্তু সংগীতশাস্ত্রবিদের উপদেশ কবিরাও গ্রহণ করতেন দেখা যাচ্ছে।

এখনকার কবি কার উপদেশ গ্রহণ করবেন? দেশে শার্ঙ্গদেব নেই, তাঁর বদলে আছে গোটাকয়েক সংগীত সংক্রান্ত সংস্কার। সংস্কারে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও গোটাকয়েক মূল ধারা আছে। সেই ধারাগুলি আমাদের মনের মধ্য দিয়ে বইছে। তাদের অস্বীকার করা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত সম্বন্ধে Research Fellow হয়েছেন। ম্যারিস কলেজেও সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী ও খেয়ালী— সর্ববিষয়ে আমাদের গৌরব।

যায় না। (রবীন্দ্রনাথ তাদের নব্যসংগীতের ভূমিকা, এবং সে ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব বলেছেন।)* একটি মূল সংস্কারের উল্লেখ করছি। পুরাতন সংগীতে বর্ষার গান প্রায়ই মল্লারে গাওয়া হতো এবং বর্ষার কবিতায় স্থায়ীভাব ছিল বিষাদ। এই 'প্রবীণা প্রথা'র প্রভাব স্বীকার করাই স্বাভাবিক, কবির ও সুররচয়িতার পক্ষে। অস্বীকার করলে পুরাতনের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়, বিচ্ছিন্ন হলে অভ্যস্ত ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ছকগুলি যায় উল্‌টেপাল্‌টে, অতএব অন্তত শ্রোতার অস্বস্তি হয়। পুরাতন ছকের পরিবর্তে নতুন ছক চাই, সেজন্য চাই সময় ও দৈবশক্তি

অতএব, মোটামুটি বলা চলে, সার্থক পরিবর্তনেই সুররচয়িতার স্বকীয় প্রতিভা পরীক্ষিত হবে। কিন্তু সকলের প্রতিভা থাকে না, তাই সংস্কারকে মেনে চলতেই সুবিধা। সব সংস্কারকে নয়, মূল ও প্রধান সংস্কারকে। রবীন্দ্রনাথের দুটি বর্ষার গানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা, হায় পথবাসী, হায় গৃহহীনা, হায় গতিহারা···' গানটি মল্লারে (দু'একটি স্থান ছাড়া) এবং 'আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে, আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে···' এই গানটি ইমনে। প্রথম গানটিতে বিষাদ হলো স্থায়ী ভাব, তাই সংস্কার অনুসারে সুররচয়িতার মনে মল্লার ফুটে উঠল। দ্বিতীয়টিতে শ্রাবণের উল্লাস হলো স্থায়ীভাব, মল্লার এখানে অনুপযুক্ত, এল ইমন, তাও আবার ইমনের পরিচিত অভিব্যক্তি নয়, ইমনের সুর-প্রকৃতি বজায় রেখে তার গতিপদ্ধতিকে কবিতায় বর্ণিত উল্লাসের অনুযায়ী ইমনের রূপ। ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে, ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে ঐ ঝড়ে, বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে, হৃদয় মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে···ইত্যাদি বাক্য কয়টির ভাব ও সুরের গতি স্মরণ করুন।

* সুর ও সঙ্গতি

শেষের গানটির দ্রুত তেওড়া তাল ভাবের ব্যস্তসমস্ত রূপটি ফুটিয়ে তুলেছে। তবু স্বীকার করতে হবে যে প্রথমটির শব্দ ও সুর সংস্কারের সহযোগেই আমাদের অধিকতর প্রিয়, নচেৎ উপযোগিতার, অর্থাৎ সৃষ্টির দিক থেকে দ্বিতীয়টি সত্যই অতুলনীয়।

পূর্বে যা বললাম সে অত্যন্ত মোটামুটি ভাবে। বর্ষার কবিতায় একাধিক ভাব ছিল, আছে ও থাকবে। বর্ষার ভিন্নভাবের কবিতায় মল্লারের ভিন্নরূপ এবং মল্লার ভিন্ন অন্য রাগরাগিণীরও সাক্ষাৎ পাই। নচেৎ অত রকমের মল্লার, মল্লারের সঙ্গে অন্য রাগিণীর মিশ্রণের কোনো অর্থই থাকে না, নচেৎ সাহিত্যও একঘেয়ে হয়ে উঠত। আজকালের তো কথাই নেই। আজকাল মনের নকশা নতুন ধরনের তৈরি হচ্ছে, সাহিত্য ও সংগীতের সংস্কার পরিবর্তিত হচ্ছে, যদিও তার মূল একেবারে উৎপাটিত হয়নি। স্থায়ীভাবের চুলচেরা ভাগ চলছে, রাগিণীর মিশ্রণ চলছে, নতুন মিশ্রণ ও ঢঙ্-এর প্রয়োজন অনুভব করছি। অতএব মূল কিংবা স্থায়ীভাবে বৈচিত্র্য আসা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাকে শৃঙ্গারের দৃষ্টান্ত বলা চলে কি?

এবার সংগীতের সংস্কারের দিক থেকে সাহিত্যিক ভাবপরিবর্তনের উপযোগী সুরমিশ্রণের তত্ত্ব নির্দেশ করতে হবে। এতক্ষণ যা বলছি তাই থেকে প্রমাণ হয় যে কবিতার মেজাজ দেখে বোঝা যাবে যে সেটি কোন শ্রেণীর রাগরূপ ধারণ করতে সমর্থ। এর বেশি সবিস্তর বলা অসম্ভব। কারণ, যদি কবিতার প্রত্যেক লাইনের সূক্ষ্ম ভাবের উপযোগী স্বরবিন্যাস কি বিকাশ পদ্ধতি খুঁজতে হয় তবে সংগীতের অপমান করা হয়। সংগীত যদি ছোটো ছোটো সাহিত্যিক ভাবের প্রকাশ করতে তৎপর হয়ে ওঠে তখন সংগীত আর সংগীত থাকে না, অনুবাদে পরিণত হয়। অর্থাৎ একটি ছোট্ট কবিতাও পালাকীর্তন হয়ে ওঠে। চিত্রশিল্পে আমরা এতদিন অনুবাদের যুগে ছিলাম—

তাকে realism বলা হতো— তার ফলে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে, সংগীতে আর ঐ প্রকারের ক্ষতি আনতে চাই না। 'ভাও বাতলানো' দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু সেটা নাচের অঙ্গ।

সে কথা থাক: আমাদের সংগীতের সংস্কারগুলিতে মিশ্রণের রীতি কিভাবে নির্দিষ্ট হচ্ছে আলোচনা করা যাক। সেই রীতিগুলিই প্রধানত বাংলা গীতিকবিতার উপযোগী সুররচনার পদ্ধতি কি হবে বলে দেবে এবং বর্তমান সুররচনার সমালোচনাও করবে। আমরা জানি যে গোটাকয়েক রাগিণী কাছাকাছি থাকতে চায়। যেমন বসন্ত, ললিত, পরজ ও সোহিনী; কেদার, হাম্বীর, ছায়নট, কামোদ, শ্যাম; দেশ, সুরট, মল্লার; বেলাওল, আলাহিয়া; কানাড়া, বাগেশ্রী, আড়ানা; খাম্বাজ, ঝিঁঝিঁট, খাম্বাবতী; টোড়ি, ভৈরবী, আশোয়ারী; রামকেলী, ভৈরোঁ, কালাংড়া প্রভৃতি। অতএব বলা চলে, যদি কোনো কবিতার মেজাজ অনুসারে বসন্ত না লাগে তবে তার কাছাকাছি কোনো সুর, যেমন পরজ, বসালে বিশেষ ক্ষতি হয় না। যদি কবিতায় একটির অধিক দুটি স্থায়ীভাব থাকে এবং সে দুটি যদি বিপরীত না হয় তবে রাগসান্নিধ্য কিংবা ঠাট অনুসারে রাগমিশ্রণই বাঞ্ছনীয়। ভৈরবীর সঙ্গে হিন্দোল খাপ খায় না, যতই ঠাট সম্বন্ধে মতভেদ থাক না কেন। আমার বিশ্বাস রাগরাগিণী সম্বন্ধে সংস্কারের ঐক্য অনৈক্যের অপেক্ষা বেশি। (যেমন হিন্দু-মুসলমানের পারিবারিক দায়িত্ববোধ আচারের ভিন্নতাকে অতিক্রম করে।) কবিতায় নিতান্ত বিপরীত ভাব থাকলে কবিতাটিই বোধহয় গীতিকবিতা হিসেবে সার্থক হয় না। তবু ভাব-পরিবর্তন মানতেই হয়, অন্তত এইযুগের সাহিত্যিক মনোভাবে।

কবিতায় ভাবপরিবর্তনের উপযোগী রাগিণীমিশ্রণের অন্য একটি মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের সংগীতপদ্ধতির কালবিভাগে। কালবিভাগের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা জানি না;

অর্থাৎ ভৈঁরোর কোমল রে ও কোমল ধা শুনলে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে এমন নিয়ম আছে বলে জানা নেই। ওটা আমাদের সংস্কার, অত্যন্ত পুরাতন না হলেও প্রায় ৩০০ বৎসরের, তাই আজ্ঞার মতনই মনে হয়। আমি এই সংস্কারের বিশ্লেষণ করছি।

রে গা ও ধা শুদ্ধ—চড়াদিকে সন্ধ্যা ৭-১২ পর্যন্ত,
পূর্বরাগ ; যেমন ইমন কল্যাণ।
নীচের দিকে সকাল ৭-১২ পর্যন্ত
উত্তররাগ ; যেমন বেলাওল,
দেশকার।

রে কোমল—গা ও নি শুদ্ধ
বিকাল বেলা ৪-৭টা পূর্বরাগ ; পূরবী
ভোর বেলা ৪-৭টা উত্তররাগ, ভৈরোঁ।

গা ও নি কোমল—রাত ১২-৪ পূর্বরাগ ; আড়ানা, কানাড়া,
দিন দুপুর ১২-৪ উত্তররাগ ; দেশী।

এই ধরনের একটা কালচক্র আমরা সকলেই লক্ষ্য করি। তা ছাড়া সন্ধিরাগ, অর্থাৎ ভোর ও সন্ধ্যার রাগের মিল সকলেরই কানে পড়ে। সকালের বিলাওল, সন্ধ্যার কল্যাণ, দুপুরবেলার সারং, দুপুররাতের আড়ানা, সকালের জৌনপুরী ও দেশকার, রাতের কানাড়া ও ভূপালির সাদৃশ্য কে না জানে? অতএব কবিতার ভাবপরিবর্তন কিংবা মিশ্রণের জন্য যদি রাগপরিবর্তন ও মিশ্রণের প্রয়োজন হয় তবে উত্তররাগের সঙ্গে পূর্বরাগের মিলনই শোভন। রাগিণীর সংস্কারের বাধা ভয়ানক বাধা, চালাকি করে সংস্কারের আধিপত্য নষ্ট করতে হয়। কতটা ভাঙন বরদাস্ত হয় তারই ওপর নতুন সৃষ্টির সার্থকতা নির্ভর করে। চিরকাল ওস্তাদবৃন্দ তাই করে এসেছেন। যে কোনো পরিচিত একটি মিশ্র রাগিণীর বিশ্লেষণ করলে তার উপাদান স্বরূপ ভিন্ন রাগিণীর মিলনযোগ্য অঙ্গ

ধরা পড়ে, যেমন আড়ানা-বাহার। শংকরার মতন খানদানী রাগিণীর নীচের অংশ কল্যাণ, ওপরের অংশ বেহাগ, আড়ানায় কানাড়া ও সারং রয়েছে।

রাগিণীমিশ্রণের একটা সংস্কারগত রীতি গড়ে উঠেছে ওস্তাদের মুখনিঃসৃত রাগমালার ভেতর দিয়ে। ধরা যাক্ খাম্বাজ শ্রেণী কিংবা ঠাটের রাগিণীগুলিকে। খাম্বাজ ধরছি এই কারণে যে খাম্বাজের সহচারী বিশেষ কোনো সাহিত্যিক স্থায়ীভাব নেই, যেমন বসন্ত রাগের আছে। তাই বোধহয় খাম্বাজকে নানা রূপ দেওয়া যায়, তার বিখ্যাত ধ্রুপদ, খেয়াল আছে, আবার টপ্পা ঠুংরি আছে, এবং খাম্বাজের সঙ্গে অনেক সুর বেমালুম মিশে যায়, যেমন ঠুংরিতে শুনেছি। নিশাসাগ, লচ্ছাসাগ কি জিলা ধরছি না। তবু খাম্বাজের সমশ্রেণীর ও কাছাকাছি অন্তত গোটা ছয়েক রাগিণী আছে— ঝিঁঝিঁট, তিলং, রাগেশ্বরী (মতভেদ ও প্রকারভেদ আছে), খাম্বাবতী (দু রকমের শুনেছি), দুর্গা-খাম্বাজ, গারা। এদের প্রত্যেকের বাদীস্বর গান্ধার, যেমন খাম্বাজের আর একটু দূরে, অথচ বেশি দূরে নয়, আরো ৪টি রাগিণী রয়েছে যেমন দেশ, সুরট, তিলককামোদ ও জয়জয়ন্তী। এদের প্রত্যেকের বাদীস্বর রেখাব। যাঁরা রাগমালা শুনেছেন মন দিয়ে তাঁরাই জানেন যে প্রথম ছয়টির যে কোনোটি থেকে শেষ চারটির যে কোনো রাগিণীতে যাওয়া যায়— যদি বিবাদী স্বর না বাধা দেয়। সোজা উপায় ও প্রধান উপায় হলো গান্ধার থেকে রেখাবে নামা। তেমনই শেষের চারটির একটি থেকে পূর্বের ছয়টির যে কোনোটিতে যাওয়া যায়, যদি বিবাদী স্বর আপত্তি না তোলে। জয়জয়ন্তী খাম্বাজের ঘর থেকে কাফি ঠাটের ঘরে যাবার রাস্তা দেখাচ্ছে। তাই একে পরমেলপ্রবেশক রাগ বলা হয়। এমনি বাদী সম্বাদীর সামান্য অদল বদলে রাগমালা তৈরি হয় এবং মালা তৈরি হবার সময় সুতো ছেঁড়ে না। বাদী-সম্বাদী ও বিবাদী

সংস্কারের স্ফটিক মূর্তি। না ভেঙে, বেঁকিয়ে চুরিয়ে দেখলেও অনেক রঙই চোখে পড়ে।

এতক্ষণ সুরের ও সুরমিশ্রণের হিসাব দিলাম, নিতান্ত আংশিক-ভাবে। আবার গীতিকবিতায় ফিরে যাওয়া যাক্। তার শব্দের প্রকৃতি ও নিজের স্থায়ীভাব নিয়ে সামান্য কিছু বলেছি—একটি দরকারী বিষয় বাদ পড়েছে, সেটা স্বরেচ্চোরণ পদ্ধতি। গান গাইবার সময়কার উচ্চারণ পদ্ধতি নিয়ে গোটাকয়েক মন্তব্য পেশ করছি। বিশেষ আলোচনা শব্দতাত্ত্বিকের কাছে পাওয়া যাবে।

১. আমাদের ভাষায় গুণবাচক বিশেষ্য কম, তাই কবিতায় বস্তুবাচক বিশেষ্যই ব্যবহার করতে হয়। অথচ বস্তুগত প্রতিমা ঠিক সংগীতধর্মী নয়। সেইজন্য গান গাইবার সময় বাংলা কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা বোধ হয় উচিত নয়। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদে হিন্দীকথা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, হলে সুরের বিকাশ হয়, ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক। অবশ্য প্রচলিত কথার এবং একাধিক স্বরবর্ণ-যুক্ত ও স্বরান্ত কথার বিপদ কম। আমাদের বিশেষণগুলিকে উপযোগী করতে হলে টেনে লম্বা করতে হয়, নচেৎ সংস্কৃত বিশেষণের আশ্রয় নিতে হয়। বৈজু বাওরার বিখ্যাত ইমনের ধ্রুপদ—

সুন্দর অতি নবীন প্রবীণ মহাচতুর নার
মৃগনয়নী মনহরণী চম্পক বরণী বার
কেশরী কটি কদলী জঙ্ঘা, নাভি সরোজ শ্রীফল উরোজ,
চন্দ্রবদনী, শুকনাসিকা, ভোঁহ ধনুষ কাম চার ইত্যাদি।

এই পদের বিশেষণগুলি এত ঘন গাঢ় যেন মনে হয় এক-একটি শব্দ স্বয়ম্ভু এবং তার প্রত্যেকটিকে খাতির না করে থাকা যায় না। কেবল তাই নয়, শুকনাসিকা কিংবা শ্রীফল উরোজ উচ্চারণ করলে শুকপক্ষী কিংবা কাঁচা কি পাকা বেলের চিত্র মনে ওঠেই না। কবিতা হিসাবে পদটি উচ্চশ্রেণীর নয়, কিন্তু উচ্চারণ-পদ্ধতির দরুন,

তার লঘুগুরু ভেদের জন্য, তার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসের জন্য গীতিকবিতা হিসাবে চমৎকার। প্রচলিত বিশেষণ কবির স্বকীয়-তার বিরোধী— কিন্তু অতিপ্রচলনেই বোধহয় সুর-রচয়িতার সুবিধা। সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হলেও পুরাতন বিশেষণগুলি অর্থজ্ঞাপন ক'রে সংগীতরসের বিঘ্ন ঘটায় না। কোথায় যেন উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার সঙ্গে আধুনিক উৎকৃষ্ট কবিতার বিরোধ আছে।

২. আমাদের ভাষা উচ্চারণে স্বরবর্ণের অপেক্ষা ব্যঞ্জনবর্ণের ও যুক্তবর্ণের ভিড় বেশি। সেইজন্য তানের স্থান সংকীর্ণ এবং ছোট্ট গমকের অবসর আছে। বড়ো গমকের স্থান মোটেই নেই মনে হয়।

৩. যদি ভিন্ন অর্থ সূচনা করবার প্রয়োজন হয় তবে আমাদের স্বরবর্ণের হ্রস্বতায় ও দৈর্ঘ্যে কোনো তারতম্য ঘটে না, যেমন ঘটে হিন্দীতে। দিনকাল ও দীনদুঃখী কথা দুটি একই ওজনে আমরা উচ্চারণ করি। তাই বাংলা গান একটু একঘেয়ে মনে হয়। সেটা সামলানো যায় হ্রস্বদীর্ঘ মেনে চললে।

৪. ক্রিয়াপদ আমাদের নিতান্ত কম। সেগুলি বাদ দিলে বাংলা স্বরান্তশব্দ আরো কমে যায়। সবই প্রায় হসন্তান্ত, অতএব, —য় জুড়ে দিতেই হয়। অতএব তানের স্থান বাংলাগানে আরো কম হতে বাধ্য।

মোটামুটি বলা চলে বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের সংকোচের জন্য, তার শ্বাসগুচ্ছের প্রকৃতির জন্য বাংলা গানের উচ্চারণ পদ্ধতি হিন্দী-ভাষার গানের উচ্চারণ পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। অতএব বাংলা গানে যে-কোনো কথাকে তানকর্তব বাটোয়ারা দেখাবার ছুতো হিসেবে ব্যবহার করা অন্যায়। ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুগ্মধ্বনির আধিক্যের জন্য বাংলা গান বোধহয় ধ্রুপদের ও ধ্রুপদ-ঘেঁষা খেয়ালেরই অনুকূল। ছোট্ট গমক, মীড়, আশ ও ছোট্ট তান সংবলিত যে কোনো গায়ন-

পদ্ধতি বাংলা গীতিকবিতায় চমৎকার খাপ খায়। নিধুবাবুর টপ্পায় সোরী মিঁঞার টপ্পার মতন তানের আধিক্য নেই। অতুলপ্রসাদ যখন নিজের গান গাইতেন তখন কি সুন্দরভাবে বিরাম দিতেন তা যিনি শুনেছেন তিনি আর জীবনে ভুলবেন না।

আমি বাংলা গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সম্বন্ধের একটা মোটা-মুটি বিচার করলাম। আমার বক্তব্যের সূক্ষ্ম বিচার বিশেষজ্ঞরা করুন। বাংলাদেশে গানের সাড়া পড়েছে, এই প্রবাসেরই ডাকে। আপনারাই তার উত্তর দিন, কারণ আপনারা এদেশের ভাষাও জানেন, বাংলাভাষাও ভোলেননি। আপনারা, অর্থাৎ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ এই অঞ্চলের ভাষা, তার উচ্চারণপদ্ধতি, তার গান গায়ন-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাভাষা ও সংগীতের তুলনামূলক বিচার করুন, তবেই একসঙ্গে সংগীতের ও সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হবে। আমার ওস্তাদ সবচেয়ে বড়ো, তোমার ওস্তাদ সুর ও তালকানা— এই মন্তব্য প্রকাশের বাইরেই সংগীতের প্রকৃত সমালোচনা শুরু হবে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সংগীত শাখার কর্তব্য নয় বাংলা গায়নপদ্ধতিকে কিংবা বাংলা গানকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করা। তার উন্নতি কিসে হয় তাই দেখতে হবে— সেজন্য চাই ভাষা ও সুরের তুলনামূলক বিচার। সাহিত্য শাখায় কয়টি শব্দতত্ত্বের প্রবন্ধ আসে জানতে চাই। সংগীত শাখায় তো কোনো প্রবন্ধই আসে না।

আমার লেখার একটা বদনাম আছে— তাতে কোনো সিদ্ধান্ত থাকে না এবং বোঝাও যায় না স্পষ্টভাবে। অন্য লেখার বিপক্ষে এই নালিশের জবাব দেব না— কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি নাচার। ক্ষেত্রটি কথা ও সুরের সীমান্ত প্রদেশ— তাই এখানকার রীতিনীতি সুশাসিত প্রদেশের মতন নয়। আর কি সিদ্ধান্তে আসব? আমিও খুঁজছি, আসুন আপনারাও খুঁজুন, কিছু পাওয়া যায়, ভাগাভাগি করা যাবে। একটা গল্প মনে পড়ছে: উইলিয়ম জেমসের লেকচার ছেলেরা

ঠিক বুঝত না— একবার একটি ছাত্র প্রশ্ন করে, 'But then Sir, what is your conclusion ?' জেম্‌স্‌ উত্তর দেন, 'But then— is the universe concluded that I should come to a conclusion ?' অবশ্য তিনি লিখতেন চমৎকার। আমি কোনো অংশেই তাঁর মতন নই। সুসাহিত্যিক নামের প্রার্থী নই বলতে পারি না, কিন্তু নতুনভাবে চিন্তা করবার প্রতিই পক্ষপাত আমার একটু যেন বেশি। সে যাই হোক— দেশটা ভারতবর্ষ, আমি শিক্ষক, তাই নিজের ধর্ম ও সুনাম রক্ষার জন্য আমার বক্তব্যগুলির নোট দিচ্ছি।

ক. সংগীতের ইতিহাস আছে বলেই বাংলা গানকে অবহেলা করা যাবে না।

খ. সুরের জগৎ কথার জগৎ থেকে পৃথক।

গ. তবু এমন কথা আছে যাকে সাজালে সুরের রাজ্যে সহজে যাওয়া যায়।

ঘ. কবিতার স্থায়ীভাব আছে।

ঙ. রাগরাগিণীরও সংস্কারগত ভাব আছে।

অতএব কবিতার স্থায়ীভাব ও সুরের সংস্কারগত অনুভাবের মধ্যে রফা করা চাই। রফার শর্তগুলি হিন্দু বিবাহের মন্ত্রের মতন নয়। ভাব বদলালে উপযোগী সুরও খুঁজতে হবে। যথাযথ সুর-মিশ্রণেরও প্রয়োজন রয়েছে। উপযোগিতার নিয়ম গায়নপদ্ধতিতে ও বাংলা কথার বিন্যাসে ও উচ্চারণে লুকিয়ে আছে। সেই নিয়মের উদ্ধার প্রয়োজন। আমি যেগুলি উদ্ধার করতে পেরেছি সেই হিসেবে আমি দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের সুরচনাকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বলি।

যৌবনের চিত্রাঙ্গদা, কবির ও পাঠকের যৌবন, আর যৌবন সভ্যতার। মোহমদির তার আবিলতা, বর্ণপ্রচুর তার দৃপ্তগরিমা, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার তপোভঙ্গে প্রেমের জয় ঘোষণা; পৌরুষে নারীত্ব, নারীত্বে পৌরুষের প্রকাশ; সংযত কামনার ভদ্র পরিশেষ, বীর্যবান ক্ষত্রিয়ের মাধুর্য অর্জন, কবিপ্রতিভার সর্বতোমুখী উন্মেষ, আমাদের যৌবনাভিলাসের সর্বাঙ্গীন সিদ্ধি।

সেই চিত্রাঙ্গদা বহু বৎসর পরে অভিনীত হলো। ইতিমধ্যে কবিপ্রতিভার, সভ্যতার, পাঠকের মনের কত না বিবর্তন সংসাধিত হয়েছে। মোহ আজ বিদূরিত, বর্ণরাজি শুভ্রতায় সংকলিত, ছন্দ সুগম্ভীর, কঠোর ও বিচিত্র, গরিমা মহিমায় পরিণত; কামনার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে অন্তরের সত্য পূর্ণ ও শান্তজ্যোতিতে বিকশিত; মোহাবেশমুক্ত চিত্ত সহজসত্যের নিরলংকৃত সৌন্দর্যে প্রদীপ্ত। তারই আলো পড়ে দর্শকের মনে। যে-মন নিতান্ত দুর্বল সে-মন অর্জুনের ক্ষাত্রবীর্য গ্রহণে অক্ষম, কেবল তার সুমধুর প্রেমনিবেদনেই সুখানুভব করে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বীরভোগ্যা— সে যেন রবীন্দ্রপ্রতিভারই প্রতিরূপ। তার নির্দেশও সার্বজনীন। অতএব চিত্রাঙ্গদা-কাব্যের রূপপরিবর্তনে আমাদের আগ্রহ প্রকাশ কর্তব্যের শামিল।

মন মুখরিত হয় ভাষায় ও গানে। সাধাণত, ভাষা ও সুর ভিন্নস্তরের বিকাশ, অবশ্য একই মনের। কিন্তু মুখরা যখন মূক হয় তখন অঙ্গসঞ্চালনেই সেই মন নিজেকে ব্যক্ত করে। নৃত্যকলা মূকের ভাষা, অক্ষর তার প্রতি অঙ্গের মুদ্রায়, বাক্য তার দৈহিক সংগতিতে, ছন্দ তার দেহের হিল্লোলে। সে ছন্দ অবার সমগ্র কারুকলার মৌলিক লয়েরই ব্যঞ্জনা। তাই নৃত্যকলা নীরব কবির কায়িক

কবিতা, সুর ও কথা তাই তার সরব সহভাবী, যেন কোনো একটি রসিক যৌথপরিবারভুক্ত। কিন্তু এই পরিবার দায়ভাগের, মিতাক্ষরার নয়। তাই নটীর পূজার নটীর মতন সকল আভরণ ঘুচিয়ে দেবার পরই নৃত্যকলা আপন অস্তিত্ব অর্জন করে। তখনই বাক্য হয় সংযত, সুরও হয় নৃত্যের অনুকুল। বাক্যের তাৎপর্যকে অবদমিত করবার পর যেমন সুরের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছিল, তেমনই বাক্য ও সুরের সার্থকতাকে অপ্রধান করবার পরই নৃত্যকলার স্বাধীন উন্মেষের প্রকৃত অবকাশ আবিষ্কৃত হল।

যৌবনের চিত্রাঙ্গদা-কাব্যের সম্ভার ছিল শব্দের, তার ধ্বনি-সন্নিবেশ আবৃত্তিরই উপযোগী। নতুন চিত্রাঙ্গদার শব্দ, বাক্য ও ধ্বনি গৌণ, তার মুখ্যভাষা হলো নৃত্য। কাব্যাংশ বাদ পড়লেও মধ্যে রইল সংগীত। সে-সংগীত রবীন্দ্র-সংগীতের অন্তর্গত হলেও একটু নতুন ধরনের। নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার সংগীত প্রধানত নৃত্যেরই উপযোগী, যে-নৃত্য আবার নাটকীয়। অতএব সংগীত এবং নৃত্য উভয় কলাই নাট্যের গল্পাংশ উদ্‌ঘাটনকার্যে নিযুক্ত।

বোধহয়, পূর্বোক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীতের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে তার প্রত্যেকটি রচনা রাগিণীর সাধারণগুণের অধিকারী হয়েও অ-সামান্য। অর্থাৎ কোনো-প্রকারেই রবীন্দ্র-রচনা আলাপধর্মী নয়। ধরা যাক ভৈরবী; ভৈরবীর আলাপে আদি স্বরস্থাপনা থেকে তান-কর্তব, ধুন-চৌধুন ও নানা-প্রকার অলংকার সমেত বিবর্তনের স্থান আছে কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতে তার বদলে আছে নানারকমের গান, যার প্রত্যেকটি ভৈরবী, কিংবা তৎসংলগ্ন সুরের আশ্রিত কোনো রাগিণী, তবু যেটি আপন অস্তিত্বে বিশেষ। হয়তো গরীয়ান, মহীয়ান নয়, তবু নিজত্বে ভরপুর, তাই এত মধুর। তার কোনোটির সম্বন্ধে বলা চলে না যে সেটি ভৈরবীর দৃষ্টান্তস্বরূপ রচনা, তার সম্বন্ধে বলা চলে যে এই গানটিতে ভৈরবী

রয়েছে। তবু কোনো রচনাই সুরে বসান কবিতা নয়, কোনো কবিতাই সুরে বসাবার জন্য লেখা হয়নি। রবীন্দ্র-সংগীতের বিশেষত্ব উদ্ভূত হয় সুর ও কথার অদ্ভুত যোগাযোগে, যেজন্য তাকে অন্যের পংক্তিতে বসান যায় না, তাকে নিয়ে যথেচ্ছাচারও চলে না।

রবীন্দ্র-সংগীতের স্বাতন্ত্র্য এতই জীবন্ত যে তাকে নৃত্যের ভাষায় অনুবাদ করলে তার ধর্মচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা বেশি। অথচ কথা-বিহীন 'তিরাণা'র নৃত্য পাখোয়াজ কিংবা বাঁয়াতবলার বোলের পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু সম্ভবপর মনে হয় না। অতএব কথা অর্থাৎ সাহিত্যিক ভাবের প্রয়োজন সর্বদাই নৃত্যকলায় রয়েছে। অন্যধারে আবার আর্টের ধর্মপরিবর্তন নিতান্ত ভয়াবহ। অনুবাদ যতই সুষ্ঠু হোক না কেন তার মূল্য মৌলিক সৃষ্টি অপেক্ষা কম। (কবি নিজেই এই তত্ত্বটুকু আমাদের বুঝিয়েছেন তাঁর চিত্রের সাহায্যে। তাঁর চিত্রে স্বধর্মাচরণে নিধনপ্রাপ্তির সংবাদে সান্ত্বনা পাই পরধর্মের আশ্রয়ত্যাগের ও আশ্রয়ভিক্ষা না করবার সাহসিকতা লক্ষ্য করে। তাঁর কোনো চিত্রই সাহিত্যের আশ্রিত নয়, রঙে গল্প বলা নয়।) অতএব রবীন্দ্র-সংগীতের সাহিত্যাংশের দৈহিক অনুবাদে কিংবা ব্যাখ্যায় রবীন্দ্র-সংগীতের সমগ্র বিশেষত্ব ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।

আজ গত কয়েক বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ নৃত্যকলার নতুন পদ্ধতি উদ্‌ভাবনে সযত্ন হয়েছেন। তাঁদের সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। যা দেখেছি তাই থেকে আমার মনে করা নিতান্ত সহজ হয়েছে যে নতুন পদ্ধতিটি রবীন্দ্র-সংগীতের আশ্রয়ে বিকশিত ও তারই বৈশিষ্ট্যে অনুগৃহীত। তার মধ্যে সুকুমারত্ব ও কৃতিত্বের যথেষ্ট নিদর্শন বর্তমান। তবু আমার বিশ্বাস যে আশ্রিত সবসময় আশ্রয়দাতার মর্যাদা রক্ষা করেনি এবং পূর্ব-চিত্রাঙ্গদা যুগের অভিনয়ে বিশুদ্ধ নৃত্যকলার বীজ থাকলেও সে-বীজ

রবীন্দ্র-সংগীতের পূর্বলিখিত বৈশিষ্ট্যের জন্য গুপ্ত ছিল। অর্থাৎ স্বাধীন নৃত্যকলার অমুস্তাবনের জন্য ঐ বিশেষত্বটুকু সম্পূর্ণভাবে বোঝবার অক্ষমতা এবং আংশিকভাবে রবীন্দ্র-সংগীতের স্বাতন্ত্র্যকেই দায়ী করা যায়। তপতী, নটীর পূজা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের যা অনুকরণ দেখেছি তাকে ভাও-বাতলান ভিন্ন অন্য আখ্যা দেওয়া চলে না। আমার বক্তব্য হলো এই, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যেই স্বাধীন নৃত্যকলার সর্বপ্রথম উন্মেষ হলো। কবিকে আশ্বাস দিতে পারি— চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের অনুকরণ হবে না। প্রবাসী বাঙালীরাও ভয় পাবেন অভিনয় করতে। তবে কি চিত্রাঙ্গদা অসার্থক হলো? না, কারণ শিল্পীমন এরই স্মৃতি থেকে সৃজনীশক্তি আহরণ করবে।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুকুমার স্বাতন্ত্র্য, উৎকর্ষ ও বিশেষ ভাবাত্মকতা ভিন্ন তাল বৈচিত্র্যের অভাবও নৃত্যশিল্পের স্বাধীন জীবনযাত্রায় বিপত্তি বাধিয়েছে। রবীন্দ্র-সংগীত বেতালা, এই মন্তব্যের অবশ্য কোনো অর্থ নেই, কারণ তাল গায়কেরই কণ্ঠে। কিন্তু প্রামাণ্য স্বরলিপিতে ও অন্য প্রকাশিত রচনায় অল্পসংখ্যক তালের নির্দেশ পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে দুটি কথা মনে রাখতে হবে; প্রথমত রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল, পঞ্চম-সোয়ারী, এমন-কি ধামার, আড় চৌতাল প্রভৃতি কঠিন তালের প্রত্যাশা করা অসংগত। দ্বিতীয়ত, যে-সংগীত বিশেষ করে গায়ক ও গানের প্রকৃতির (মেজাজের) সাহচর্যে সার্থক হয় তার গায়নপদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাটোয়ারার সুযোগ নিতান্ত কম। (উৎকৃষ্ট খেয়ালিয়া বন্দেশি গানে সংগতিয়ার কাছে কেবল ঠেকাই চান।) কিন্তু দুটি কথা স্মরণ রাখবার পরও সমস্যাটি জীবিত থাকে। সমস্যা হলো রবীন্দ্র-সংগীতের সাহচর্যে যে নৃত্যপদ্ধতি বর্ধিত হয়েছে তাকে স্বাধীন হবার সুযোগ দেওয়া, সাহচর্যের অর্জিত গুণাবলীকে না ত্যাগ করে। সমস্য হলো পরমাত্মীয়কে মুক্তি দেওয়া। রবীন্দ্র-সংগীতেই নৃত্যসৃষ্টির বীজ ছিল, সে-বীজের পাট

করতে হবে, তাই আশ্রয়দাতা বৃক্ষটিকে পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার, নচেৎ তাল-বিভাগের জট ও ঝুরিতে নৃত্য যাবে শুকিয়ে।

চিত্রাঙ্গদার নাটকত্বই রবীন্দ্রনাথের সহায়ক হলো। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য, নৃত্যও আবার সংগীতমুখর। সুরমুখর নৃত্যে তালবৈচিত্র্যের অবকাশ খুবই বেশি, সংগীতমুখর নৃত্যে অবকাশ সংকীর্ণ হয়ে আসে ; (সংগীত অর্থে কথা ও সুরের যোগের ফল, রাগিণী-আলাপের বিপরীত) কারণ নচেৎ নাটকত্বের জন্য যে মনঃসংযোগের প্রয়োজন সেটি হবে বিভক্ত। নাটকীয় একাগ্রতাকে যত কম বিক্ষিপ্ত করা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু লয়কে বাদ দেওয়া কখনোই চলে না। লয় হলো যান্ত্রিক মাত্রাভাগের পিছনকার মূলগত ছন্দটি। লয় নিয়ন্ত্রিত হয় রচনার প্রকৃতির দ্বারা। রচনা যদি নাটকীয় সংগীত হয় তবে আদিমছন্দেরই পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়, কেবল মাত্রা-সমষ্টির অসম, বি-সম বিভাগ কিংবা তাল-বৈচিত্র্য নয়। অতএব রবীন্দ্র-সংগীতে তালের সংখ্যা কম স্বীকার করেও নৃত্যনাট্য-চিত্রাঙ্গদার বিচারে সে অভিযোগ অগ্রাহ্য। এক্ষেত্রে লয়ের বিচারই সংগত। আমার বিশ্বাস চিত্রাঙ্গদায় সংগীতের লয়পরিবর্তন নাটকের প্রয়োজনীয় গতি-পরিবর্তনের অনুযায়ী হয়েছিল। দু-এক ক্ষেত্রে ত্রুটি লক্ষ্য করি নি যে তা নয়। তবে পূর্বের মতন নয়। সামান্য ত্রিতালিতেও ইতিপূর্বে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল পদক্ষেপ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ে প্রত্যেক নর্তক-নর্তকীর পদক্ষেপ ছিল নির্ভুল, যদিও চিত্রাঙ্গদার মতন নৃত্যনাট্যে সে ভুল মার্জনা করা হয়তো শক্ত ছিল না। কেবল তাই নয়, ঝাঁপতালের মতন গম্ভীর তালে, যখন সংগীত ও বাক্য স্তব্ধ তখনও, অর্থাৎ নিরালম্ব, শুদ্ধ ও স্বাধীন নৃত্যেও আমি 'আড়ির কাজ' লক্ষ্য করেছি। আরো কতটা তালের উন্নতি নৃত্যনাট্যে সম্ভব সে-বিচারের স্থান অন্যত্র, কিন্তু উন্নতি যে হয়েছে এবং সে উন্নতি যে প্রয়োজনের, অতএব

ভব্যতার অতিক্রম করে আড়ম্বরে পরিণত হয়নি এইটুকুই আমার এখানকার বক্তব্য।

সংক্ষিপ্তভাবে আবার বলি, শান্তিনিকেতনে স্বতন্ত্র নৃত্যকলার উদ্ভাবনের জন্য দুটি শর্তরক্ষার প্রয়োজন ছিল, প্রথমত সাহিত্যিক উৎকর্ষ অথচ কোনো বিশেষ ভাবাশ্রিত সংগীতরচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি, দ্বিতীয়ত তালের খানিকটা বৈচিত্র্য-বৃদ্ধি। সংগীত হিসেবে, (রাগিণীর বিকাশের দিক থেকেও) কোনো রচনা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট হবে সেই পরিমাণে সে-রচনা নৃত্যকলার স্বাতন্ত্র্য-অর্জনে বাধা দেবে। কাব্যের বেলাও তাই, গূঢ়ভাবব্যঞ্জক কিংবা সূক্ষ্ম অর্থবাহী কবিতা নৃত্যের অনুপযোগী। চিত্রাঙ্গদার অধিকাংশ সংগীত (সবগুলি নয়, অনেক রচনা চিত্রাঙ্গদার জন্য লেখা হয়নি) নৃত্যের এবং নৃত্যনাট্যের নিতান্ত অনুকূল। তার মধ্যে ছড়া, আবৃত্তির উপযোগী কবিতা, উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা, ও সংগীত রচনা সবই বর্তমান, নাটকের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনই তাদের সার্থকতা, কিন্তু মোটের ওপর সংগীতের ধারাটি নৃত্যলীলাকে সমর্থন করে, তাকে ফুটতে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। 'মোটের ওপর' অর্থে গড়পড়তা নয়, সমগ্রতার অনুভূতিকে ইঙ্গিত করছি। সংগীতের এই আত্মসংযম না থাকলে চিত্রাঙ্গদা নামক নৃত্যনাট্যের বিশেষত্ব থাকত না, রবীন্দ্রনাথের রচিত অন্যান্য গীতি-নাট্যের পুনরাবৃত্তি হতো। নতুন সৃষ্টির জন্য পূর্বোক্ত সংযমের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

চিত্রাঙ্গদাকে স্বাধীন নৃত্যের ক্ষেত্র ভেবে ক্ষান্ত হলে তার প্রতি অন্যায় করা হবে। চিত্রাঙ্গদা নাট্য, কিন্তু নৃত্যনাট্য ; অর্থাৎ সাধারণ নাটকের কথোপকথনের পরিবর্তে চিত্রাঙ্গদার পাত্র-পাত্রী ভাব-বিনিময়ও প্রকাশ করেন নৃত্যের দ্বারা। ভাবকে যে কালে ব্যক্ত করতে হবে তখন সর্বাঙ্গের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী, মাত্র পা দুটির ওপর নির্ভর করলে চলবে না। তাই বলে চিত্রঙ্গদা সমস্যাপূরক মূক অভিনয়

(স্যারাড্) নয়। চিত্রাঙ্গদার নৃত্য সংগীতমুখর নৃত্য, পাত্র-পাত্রীর কণ্ঠে অবরুদ্ধ নয়, আবার সে নৃত্য কণ্ঠ-নিসৃত সংগীতের দৈহিক অনুবাদও নয়। নৃত্যনাট্য অবশ্যই নাট্য, তার মধ্যে গল্প আছে, সে গল্পের নাটকীয় গুণাবলী ও বিবর্তন আছে। নাট্যই হলো মূল, প্রধান শাখা হলো সংগীত। স্ফটিক যেমন মূল সূত্রটির চারপাশে বিরচিত হয়, তেমনই চিত্রাঙ্গদার অনুভূতি নাট্যকে ঘিরেই দানা বাঁধবে। তখন নাট্যের তাৎপর্যের তুলনায় সংগীতের মূল্য অপ্রধান, কলমের একপার্শ্ব মাত্র। অন্যভাবে বলা যায়, চিত্রঙ্গদার নাটকত্ব উপযোগী সংগীতের আভাসে পরিস্ফুট হবে, আশ্রয়ে নয়।

চিত্রাঙ্গদা নাটকটি রবীন্দ্রনাথেরই নাটক, অন্য কারুর নয়। তার অন্তর্নিহিত বিরোধের চেয়ে আদর্শের অভিব্যক্তিটাই উপভোগ্য। বিসর্জন প্রভৃতি দু-একখানি নাটক ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ইদানীংকার প্রায় সমস্ত নাটকের মূলতত্ত্ব চারিত্রিক ব্যবহারের ঘাতপ্রতিঘাত নয়, মানসিক ব্যবহারের প্রগতি। মনোময় জগতের বিবর্তন নিয়ে যদি নাটক লেখা হয় তবে সে-নাটক পদ্য, বিশেষত মরমী-পদ্য ব্যবহার করবে, এবং সেখানে সেইজন্য সংগীতের স্থান স্বভাবতই সুপ্রশস্ত। মানসিক অভিব্যক্তির দিক থেকে বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা এবং নাট্যের আঙ্গিক প্রধানত সাংগীতিক। পূর্বোক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য এই, মোহমুক্তি যে-নাট্যের সংকটময় পরিশেষ তাকে সেইভাবে দৈহিক অনুবাদ কিংবা অভিনয়ের দ্বারা প্রকট করা চলে না যেমন সম্ভব 'রাজহংসের মৃত্যু' কিংবা দুঃশাসনের রক্তপান প্রভৃতি বিষয়কে। চিত্রাঙ্গদা নাট্যের অ-বাকগোচর ও বিদ্রোহী বিশেষত্বটুকু তার আঙ্গিককে নিরূপিত করার পরও তাকে রক্ষা করেছে বিদেশী অপেরার ভাবপ্রবণতা এবং কথাকলির দৈহিক কিংবা জৈবিক অভিনয় থেকে। প্রমাণ, চিত্রাঙ্গদার গল্প বোঝার চেয়ে চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যনাট্যে অন্য একটি আনন্দের উপকরণ ছিল।

সেইজন্য গল্পের ধারাটি দু-এক স্থানে বিচ্ছিন্ন হলেও না-বোঝার ব্যাকুলতায় আমি পীড়িত হইনি। সংগীত ও নৃত্যের মীড়ে দু-একস্থলে আমার গল্পানুসরণবৃত্তি রুদ্ধ হলেও সেজন্য আমার মনে কোনো আক্ষেপ ওঠেনি।

তবু চিত্রাঙ্গদা নাট্য, তার পাত্র-পাত্রী একাধিক, তার গতি একমুখী হলেও একটানা নয়, তাতে জোয়ারভাঁটা আছে; খালবিলের জল এসে তাতে পড়েছে। তাই সেখানে সমবেত বা. পুঞ্জ-নৃত্যের অবকাশ যথেষ্ট রয়েছে। লক্ষ্ণৌএর কালকা-বৃন্দার প্রবর্তিত এবং সমগ্র উত্তরভারতে প্রচলিত 'কথক'-নৃত্যে (যাকে ভুল করে ক্ল্যাসিক্যাল বলা হয়, কিন্তু যেটি প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক ও ঠুংরির আশ্রিত) নাটকীয় গুণ যা আছে তা প্রকট হয় মাত্র একজনেরই অঙ্গভঙ্গিতে। তিনিই কখনও রাধা, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বা গোপিনী। নায়িকা হয়ে কখনও তিনি নওল-বলা, কখনও প্রৌঢ়া-ধীরা, কখনও বা বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, গুণগর্বিতা; নায়ক হয়ে কভু দুঃসন্ধানী, কভু শঠ নিপট, কভু বা স্বয়ং দূত। তিনি একাই বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ভিন্ন ভিন্ন রসের উত্তেজক সংস্থান সৃষ্টি করেন।

দেশী নৃত্যেই বহুর স্থান আছে। নাটক যখন বহুনিষ্ঠ, এবং মার্গপদ্ধতিতে সমবেত নৃত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমরা অচেতন ও অজ্ঞান তখন নাট্যনৃত্যে কবি দেশী নৃত্যের ঐ আঙ্গিকটুকু গ্রহণ করতে বাধ্য। এই বহুর ব্যবহার নিতান্তই দায়িত্বপূর্ণ। সংখ্যাধিক্য এককের ও স্বকীয়তার সর্বনাশ ঘটাতে সদাই তৎপর। তাই সাবধানের বিশেষ প্রয়োজন। প্রয়োগকুশল শিল্পীর হাতে বহুর অস্তিত্ব এককের— অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধের গুরুত্ব নির্ধারণ করে। তখন পাত্র পাত্রীর কাজ হলো যেন তরফের, নায়ক-নায়িকা যেমন জুড়রি। মূলগত ঐক্যের সাথে ঐপ্রকার আন্তরিক দেনা-পাওনা যদি না থাকে তবে পাত্র-পাত্রী কেবল ভিড় জমায়। ভিড়ের

এক ভিড় করা ছাড়া অন্য কোনো সার্থকতা নেই, তার মধ্য থেকে স্বতই কোনো সম্বন্ধ রচিত হয় না, বরঞ্চ প্রধান সম্বন্ধটিকে গোপন করে, নীচুস্তরে নামিয়ে আনে। কিন্তু নায়ক-নায়িকার ব্যবহারে বিরোধ ও বিবর্তন দেখান যদি উদ্দেশ্য হয় এবং সেই সঙ্গে অন্য পাত্র-পাত্রীর অবতারণা করার যদি প্রয়োজন থাকে, যেমন নাটকে থাকতে বাধ্য, তবে নায়ক-নায়িকা ও পাত্র-পাত্রীর ব্যবহারকে গ্রথিত করা চাই।

সম্বন্ধ স্থাপনের পর, সম্বন্ধের সূক্ষ্মতা বজায় না রাখলেও চলে। এতদূর পর্যন্ত বলা যায় যে সম্বন্ধের সূত্রটি অতিশয় পাতলা হলে গঠনটাই পলকা হয়। সংগীত থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। খেয়াল তান-প্রধান, দেশ অতি মধুর রাগিণী, দেশের খেয়ালে তান খুবই চলে; বন্দেমাতরম নামে জাতীয় সংগীতটি একসময়ে দেশ-এ গাওয়া হতো (পরে তিলককামোদ, ছায়ানটেও শুনেছি)। একজনের কণ্ঠে দেশ-এর বন্দেমাতরম সহনীয় ছিল, কিন্তু কোরাসে, অর্থাৎ সমবেতকণ্ঠে কলকলনিনাদে যখন মুখরিত হতো তখন গানটি হয়ে উঠত অশ্রাব্য। তানকর্তব একজনের কণ্ঠেই শোভা পায়—কোরাসে অচল। এই সোজা কথাটি দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন, তাই তাঁর কোরাস রচনায় কারুকার্য কিংবা কোমল পর্দার আতিশয্য আনেননি। তালের বেলাও তাই। সমবেত প্রকাশে শ্রুতি, তান ও তালের বাহাদুরী দেখান যায় না, উচিত নয়। তেমনি, একক নৃত্যে তালের চুলচেরা ভাগ ও আড়ম্বরের অনেকটা সুযোগ থাকলেও পুঞ্জ-নৃত্যে মোটেই নেই। এখানে স্থূল হওয়া ছাড়া নাস্তি গতিরন্যথা। তবু যখন নাটকে পাত্র-পাত্রীর চেয়ে নায়ক-নায়িকাই প্রধান তখন পুঞ্জ-নৃত্যকে নায়ক-নায়িকার একক কিংবা দ্বৈত-নৃত্যের চেয়ে প্রসিদ্ধি দেওয়া অসংগত। বহু এককেরই আশ্রিত, একক থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার সত্তা লোপ পাবে। সে যেন নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধরূপ ঐক্যের চারপাশে

জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করছে। পূর্বের মন্তব্যটিও স্মরণ রাখা চাই—শুদ্ধতা অর্জনের আরোহণপথ পথ হলো নিরালম্বতা। অর্থাৎ সমগ্র নৃত্যের মধ্যে নায়ক-নায়িকার নৃত্যই আদর্শ, বাকি পাত্র-পাত্রীর নৃত্য সমর্থন মাত্র, গৌরীশৃঙ্গের চারপাশে অন্যান্য উঁচু পাহাড় ও নিম্নতর মালভূমির মতন। দেশী নৃত্যের মধ্যে মণিপুরী নৃত্যেই বহু তার যথার্থ স্থান পেয়েছে। চিত্রাঙ্গদা নিজে মণিপুরের রাজকন্যা এই কথাটি চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিক গ্রহণের চূড়ান্ত কারণ নয়।

বলা বাহুল্য, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা নাট্যের নায়ক-নায়িকা, তাঁরা ভিন্নদেশের রাজপুত্র ও রাজকন্যা। চিত্রাঙ্গদার দেশে, মণিপুরে, অর্জুন এসেছেন একাকী অজ্ঞাতবাসের পরিশেষে। যুবতী চিত্রাঙ্গদা যুবকের মতনই প্রতিপালিত, তাঁর অদ্ভুত পুরুষজনোচিত শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস তাঁর সখীগণই বিবৃত করতে পারেন। তদ্‌ভিন্ন অর্জুনের বন্যপরিচর, গ্রামবাসীগণও রয়েছে। আর আছেন মদন। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ব্যবহারই নাটকের প্রধান অধিশ্রয়ণ। তাঁদের ভাব-বিনিময়ের প্রতিফলন হবে মদন ব্যতীত নাট্যমঞ্চস্থ অন্যান্য ব্যক্তির ওপর। কখনও তারাই সেই মূল সম্বন্ধের অভিব্যক্তির সাতত্য বজায় রাখবে, সময় সময় আবার তারাই হবে সে ব্যবহারের প্রতিবাদী। মৌলিক সুর ও নৃত্য পরিপুষ্ট হবে তাদেরই সহযোগী পারিপার্শ্বিকে, না হয় বৈপরীত্যে। চিত্রাঙ্গদা নাট্যে সমবেত নৃত্যকে নানারূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

তবু যদি চরিত্র উদ্‌ঘাটনের ধারা শুকিয়ে যায়, বিবর্তন শিথিল হয়, ছক্ হয় ছিন্নভিন্ন, তবে মদনের আশীর্বাদে এবং মঞ্চের এক কোণে কবির উপস্থিতিতে ও তাঁর অবৃত্তি ও মন্ত্রপাঠে সে-ধারা আবার বইবে, সে-বন্ধন কঠিন হবে, সে-ছকে জোড়া লাগবে। বন্ধনরীতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার এই আঙ্গিকটি আমাদের পরিচিত। চিত্রাঙ্গদার

অভিনয়ে বন্ধনরীতি সংস্কৃত নাট্য এবং দেশী যাত্রা থেকে নেওয়া। অবশ্য মার্জিত করে, যদিও তার ব্যবহারটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। পুরাতনের ভূমিকায় সমবেত নৃত্যের অভাব স্মরণ রাখলেই দেখা যাবে চিত্রাঙ্গদার কৃতিত্ব কতটা বিপ্লবাত্মক। পুঞ্জ-নৃত্য বোধহয় ধ্রুবপদী নয়, শাস্ত্রেও তার আঙ্গিক বর্ণিত আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। এখানে আমার ও অন্যান্য জনসাধারণের অজ্ঞানতাকে তথ্য হিসাবে ধরলে বোঝা যায় যে সংস্কৃতি যে কালে বিচ্ছিন্ন, যখন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমরা অচেতন তখন তাকে ভিত্তি করে নতুন ইমারত গড়া চলে না। শুনেছি, একজন বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদের স্মৃতিপটে চিত্রাঙ্গদার নৃত্যাভিনয় গুপ্তরাজ্যের সমসাময়িক কৃষ্টি জাগ্রত করেছিল। পণ্ডিতদের পক্ষে সবই সম্ভব। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া যেমনই অসম্ভব তেমনই অসম্ভব পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। একেই মার্গনৃত্যের পুনরাবৃত্তি এক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব, তার ওপর স্রষ্টা ও প্রযোজক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ধরার বুক থেকে রস উদ্‌গমন করে মুমূর্ষু ও প্রবীন পিতামহ-পন্থার প্রাণসঞ্চার একমাত্র বীর্যবান উত্তরাধিকারীরই সামর্থ্যের মধ্যে। সংস্কারের তৃষ্ণানিবারণের পর নবজীবনের লক্ষণ সূচিত হয়। সৃষ্টির এই লীলারহস্যটি কবির আয়ত্তাধীন। মার্গসংগীত যখন শুচিবাইগ্রস্ত তখন তিনি তার সাথে বাউল-ভাটিয়াল মিশিয়ে সংগীতের নতুন জাতি তৈরি করলেন। ব্রাহ্মণ তাকে অপাঙক্তেয় করলে, তবু তার মৃত্যু হলো না। কবির নৃত্যকল্পনাতেও তাই হয়েছে, জ্যোতিষী না হয়েও বলা যায়, এই উপায়েই চলবে। সংগীতের বর্ণসংকর এবং নৃত্যে বর্ণসংকরের মধ্যে পার্থক্য আছে। যতটুকু পার্থক্য ততটুক তার কৃতিত্বের আধিক্য। মার্গ কিংবা ধ্রুবপদী পদ্ধতি আমাদের কাছে অনেকটা জীবন্ত ছিল, আমাদের জাতীয় অবচেতনা থেকে সেটি কখনই বিলুপ্ত হয়নি, যদিও তার জীবন গতানুগতিকতারই নামান্তর

ছিল। কিন্তু মার্গ কিংবা ধ্রুবপদী নৃত্যরূপ কি ছিল আমরা জানি না। বল্লী-নৃত্যকে কিংবা দক্ষিণভারতীয় নৃত্যকে মৌলিক বলব? তাও কি আমাদের সংস্কারগত? বাইজী-নৃত্য যে ধ্রুব নয় সে বিষয়ে অমরা নিঃসন্দেহ, যদিও সেটি সুপ্রচলিত স্বীকার করতেই হবে। এ-দুটির মধ্যে প্রথমটিতে ধ্রুবপদ্ধতি আংশিকভাবে বর্তমান আছে অনুমান করা অসংগত নয়। সে-রূপও আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার বাইরে, যদিও দক্ষিণী-জনসাধারণের অপরিচিত নয়। যেখানে সংস্কার নেই সেখানে সৃষ্টি দুরূহ। অনেকে বিপরীত কথা বলবেন নিশ্চয়; নৈরাজ্য থেকে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার মূল্য অস্বীকার্য; কিন্তু সে-রাজ্য কত সুদৃঢ় হয় জানি না। মাইকেলী ছন্দের ভাগ্য লক্ষ্য করে আর কী ভাবা যায়? অবশ্য রবীন্দ্র-সংগীতের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি সক্রিয়, রবীন্দ্র-নৃত্যের সম্বন্ধে মনোভাব উদাসীনের। সক্রিয়তার অপেক্ষা নিষ্ক্রিয় বিরাগের শক্তি বেশি, এই যা বিপদ।

অতএব পণ্ডিতের দল যাই বলুন না কেন, নৃত্যনাট্যের স্বকীয় প্রয়োজনের জন্য পুঞ্জনৃত্যকে গ্রহণ যদি করতেই হয়, তবে দেশী-নৃত্যকে একক নৃত্যের সাথেই বরণ করতে হবে, তবেই নৃত্যকলার ইতিহাসে সৃষ্টিমুখী বিপ্লব সংসাধিত হবে। বাংলার দেশী-নৃত্যের মধ্যে যতগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তার মধ্যে অন্তত একটিকে নিয়ে কবি ইতিমধ্যে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু বাউলের নাচ নাচতে পারে একা বাউল, যেমন ফাল্‌গুনীতে সে নেচেছিল, কিন্তু সব নাটকে বাউল আনা যায় না, অর্জুনও বাউল সাজতে পারেন না, চিত্রাঙ্গদা তো দূরের কথা। সেরাইখেল, গাজন, রাইবেঁশের সংস্কার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তাদের পুনঃপ্রচলনে যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও বলা যায় যে চিত্রাঙ্গদায় তাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। ইদানীং, দেশী-নৃত্যের মধ্যে দুটির প্রতিষ্ঠা হয়েছে—

কবির আশীর্বাদে মণিপুরীর এবং ভালাঠোল ও উদয়শংকরের কৃপায় মালাবরী কথাকলির। আর-একটি পদ্ধতির প্রতিপত্তি সমগ্র উত্তর-ভারতে পরিব্যাপ্ত, সেটি একক নৃত্য— অর্থাৎ নায়ক-নায়িকারই উপযোগী। তার প্রবর্তক লক্ষ্ণৌএর যুগল কলাবিদ— কালকা ও বৃন্দা মহারাজ। তাঁদের পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব নয়, তবু তার পরিব্যাপ্তির জন্যও অন্তত তাকে বাদ দেওয়া যায় না। ধ্রুব না হলেও আমাদের ধারণা যে সেটি ধ্রুব। (আমার নিজের বিশ্বাস যে পদ্ধতিটি দেশী, অযোধ্যার দান; কাজরী, ঝুলন, চৈতী প্রভৃতি লোকনৃত্যেই তার ভিত্তি।) চিত্রাঙ্গদার জন্য নৃত্যরূপ কল্পনা করতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে মণিপুরী, মালাবরী ও লক্ষ্ণৌ-নৃত্যের ঋণী হওয়াই স্বাভাবিক। এই তিনটির অদ্ভুত সংমিশ্রণ চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যে বিশ্লেষণের ফলে ধরা পড়ে। অনুপাত অবশ্য বিভিন্ন। নায়িকার জন্য লক্ষ্ণৌ, নায়কের জন্য দক্ষিণী, পুঞ্জের জন্য মণিপুরী। তা ছাড়া সংকলন ও কৃতিত্ব সর্বদাই মনে থাকা চাই এবং মনেও পড়ে।

কালকা-বৃন্দা নিজেরা কেমন নাচতেন ও বাজাতেন আমি জানি না, আমি যখন লক্ষ্ণৌ প্রবাসী হই তখন হাটে ভাঙন ধরেছে। তবু তাঁদের পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র ও একাধিক শিষ্য-শিষ্যার নৃত্য দেখে বলতে পারি যে তাঁদের প্রবর্তিত নৃত্যকলার অনেক অলংকার শান্তিনিকেতনী নৃত্যে বাদ দেওয়া হলেও তার মূল তত্ত্বটি অন্তত চিত্রাঙ্গদার নৃত্যে পরিত্যক্ত হয়নি। গ্রহণের ক্ষেত্রটি প্রথমেই জরিপ করা ভালো। পূর্বেই লিখেছি, লক্ষ্ণৌ-নৃত্যে বহুর স্থান নেই, অতএব সমবেত-নৃত্যের আঙ্গিক সেখানে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় ব্যক্তিগত নৃত্য, অর্থাৎ নর্তক কিংবা নর্তকী একাই যেখানে একাধিকের সাথে সম্বন্ধ ফুটিয়ে তুলছেন। লক্ষ্ণৌ নৃত্যের অন্য আঙ্গিক আছে— মুদ্রা, চোখের ব্যঞ্জনা ও ভ্রূ ও গ্রীবা সঞ্চারণ এবং পায়ের কাজ। বাইজীরা মুদ্রা দেখান না, আচ্ছান সাহেব ও শম্ভু

মহারাজ মুদ্রা ব্যবহার করেন— শান্তিনিকেতনে মুদ্রা আছে ; যদিও যৎসামান্য এবং বোধহয় অশাস্ত্রীয়। চিত্রাঙ্গদা নাট্যে মুদ্রার যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও ব্যবহৃত হয়নি। চক্ষু ও ভ্রূর সঞ্চালন ছিলই না বললে অত্যুক্তি হয় না। উগ্রভাবে কটাক্ষ ও ভ্রূ কিংবা গ্রীবা সঞ্চালন নিশ্চয়ই অভদ্রতা, কিন্তু রিপুকেও মিত্র ভাবা চলে সাধনার কোনো এক বিশেষ স্তরে। তারপর 'পায়ের কাজ'। লোকে যাকে পায়ের কাজ বলে সেটি তাল বাঁটোয়ারার বোলের পদানুবর্তিতা। সেটি সত্যই অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। ধামারের মতন অসম বিভাগের তালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ, আড়ি, দেড়ী, কুয়াড়ি, বিসম, অনাঘাত প্রভৃতি যেসব কারুকার্য পাখোয়াজের বোলের সাহায্যে হোরী-ধামারের সম্পদ বৃদ্ধি করে সেগুলি দুটি পায়ের উত্থান-পতন ও ঘুঙুরের দ্বারা কি স্পষ্টভাবে অনুকৃত হয় না-শুনলে প্রত্যয় হয় না। তবু, তবু আমি বলি এই পায়ের কাজ কালকা-বৃন্দার প্রধান কৃতিত্ব নয়, লক্ষ্ণৌএ প্রবর্তিত নৃত্যপদ্ধতির প্রাণবস্তু নয়। যাঁরা লক্ষ্ণৌ-নৃত্যকে নতুন বলে শ্রদ্ধা করতে উৎসুক তারা 'পায়ে বোল' বাজানকে মহৎসৃষ্টি ভাবতে পারবেন না, এমন কি তার নতুনত্বের জন্য, ভাও-বাতলানর অদ্ভুত কৌশল স্বীকার ভিন্ন অন্য দাবী পেশ করতে হবে। ভাওবাতলান জিনিসটি বহু পুরাতন। 'ভাওবাতলান' ভাবের এক প্রকার না হয় দশ প্রকার ব্যাখ্যা, অতএব সেটি নৃত্যের একটি প্রধান আঙ্গিক বরাবরই ছিল। কালকা-বৃন্দা না হয় দশ প্রকার বিশদ ও চমকপ্রদ ব্যাখ্যা করতেন কল্পনা করা যায়। কিন্তু তবুও সে ব্যাখ্যাগুলি নৃত্যের আশ্রয়দাতা সংগীতের বাক্যের সমর্থন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ধরা যাক্— লক্ষ্ণৌ-এর নৃত্য দেখছি, মধ্যে নর্তক, পার্শ্বে সারেঙ্গীয়া ও তবলিয়া, সারেঙ্গীতে সুর চলছে, নর্তক যদি সুকণ্ঠ হন তবে তিনি নিজে সেই সুরের গানের পদ গাইছেন, না হয় অন্য একজনও গাইতে পারেন। ধরা যাক্ গানটি 'বালমোরে

চুনরিয়া ম্যায় লালে রঙ্গাদে' অর্থাৎ, 'হে প্রিয় আমার সাড়িটা লাল রঙে ভিজিয়ে দাও।' নর্তক একাই নায়ক এবং নায়িকা, তিনি এই পদটির ব্যাখ্যা করছেন নানা ছন্দে। আমি প্রায় বারো রকমের 'ভাও' দেখেছি, তার মধ্যে গোটাকয়েক বুঝেছিলাম— দু তিনটি লিখছি ; ১. নায়িকা নায়ককে জোর করে পান খাওয়াচ্ছেন, তিনি খাবেন না যতক্ষণ না নায়িকা আগে খেয়ে প্রসাদ দেন, তাই হলো, নায়কের ঠোঁট বড়োই লাল, নায়িকা ওড়নার প্রান্ত দিয়ে নায়কের ঠোঁট পুঁছিয়ে দিলেন ; ২. নায়ক ভোরবেলা বাসকশয্যা ত্যাগ করে বাড়ি ফিরছেন, নায়িকা তখনও নিদ্রিতা, উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে প্রভাত সূর্যের আরক্ত আভা মুখে পড়েছে, নায়ক যাবার সময় নায়িকার মুখ ওড়না দিয়ে আবৃত করলেন ; ৩. নায়িকার ঘরে নায়ক রাত্রিযাপন করছেন, এমন সময় সখা খবর দিলেন শত্রু এসেছে, নায়ক তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা করে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত, নায়িকা কোমরে তলোয়ার বাঁধতে দেরি করছেন, তুর্যধ্বনি হলো, খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নায়ক ছুটে যাবেন, নায়িকা মধুর বাধা সৃজন করলেন, তাঁর হাত কেটে গেল, নায়ক ওড়না দিয়ে আঙুল বেঁধে দিলেন। প্রত্যেক ভাবেই চুনরি লাল হচ্ছে। এইরকম আরো কত ইঙ্গিত 'ভাও'-এর সাহায্যে সুস্পষ্ট হয়। বাহাদুরি হলো এই, যে এক, জোর দুই কি তিন আবর্তের মধ্যে (একটি সম্ থেকে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সমের মধ্যে) ঘটনাটি সুচারুরূপে ব্যক্ত করা চাই। কিন্তু তবু, নৃত্য কি এত বাহাদুরি সত্বেও গানটির পদাশ্রিত নয় ? অর্থাৎ, নৃত্যকলা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় নি। অথচ লক্ষ্ণৌ-এর নৃত্যকলা একটি সুন্দর সৃষ্টি। তার সৌন্দর্য পূর্ববর্ণিত অলংকার প্রাচুর্যে নয়, তার মূল সৌন্দর্য হলো নর্তক-নর্তকীর রেখান্বিত দৈহিক ভঙ্গিমার সমঞ্জস সাধনের ইঙ্গিতে। 'রেখান্বিত' কথাটি মনে রাখতে হবে। এই রেখাভঙ্গীর চলন্ত সমাবেশ এবং সংগীতাধীনত্ব শান্তিনিকেতনী নৃত্যে

বর্তমান ছিল, পায়ের কাজ, ভ্রূ ও কটাক্ষ প্রভৃতি অবর্তমান থাকা সত্ত্বেও। অতএব লক্ষ্ণৌ-নৃত্যের সমস্যা এবং শান্তিনিকেতনী-নৃত্যের সমস্যার মূল একই। সংগীত ভিন্ন অন্য প্রেরণা চাই, অর্থাৎ দেহ নিজের ভাবে রেখায়িত হোক, ভেঙে যাক, নতুন ছন্দে নেচে উঠুক। যতক্ষণ না নৃত্য স্বাধীন হচ্ছে ততক্ষণ দেহজ অর্থাৎ নৃত্য-তরঙ্গের ছন্দের সঙ্গে সাংগীতিক তালমান লয়ের বিরোধ সম্ভাবনা দূর হবে না। সত্য সত্যই যে ঐ ছুটি ছন্দের বিরোধ বাধে আমি দেখেছি।

পূর্বকথিত রেখায়িত তরঙ্গ দক্ষিণী কিংবা বলী-নৃত্যের বিশিষ্ট আঙ্গিক নয়। দক্ষিণী-নৃত্যেও 'ভাও-বাতানা' আছে, পায়ের কাজও নেই যে তা নয়। বালা-সরস্বতী ও তাঞ্জোর অঞ্চলের একাধিক নর্তকীর নৃত্যে খাস্ লক্ষ্ণৌইয়ারও দিলখোশ্ হয়। কিন্তু দক্ষিণী ও বলী-নৃত্যের ধর্মই ভিন্ন, সেটি অভিনয়ের। উদয়শংকর যাঁকে এখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেন, সেই শংকরম নম্বুদ্রীর, রাগিণীদেবীর গুরু গোপীনাথের, মালাবারের শ্রেষ্ঠ কবি ভালাটোলের প্রতিষ্ঠিত কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত দলের, এবং আরো তুচারজন মাদ্রাজ অঞ্চলের প্রথিতযশা নর্তক-নর্তকীর নৃত্য দেখে মনে হয়েছে যে দক্ষিণভারতীয় নৃত্য এখনও অভিনয়ের সংজ্ঞায় পড়ে। পূজারিণী-নৃত্যে অভিনয়াংশ নিতান্ত কম, কিন্তু পূজারিণীর সংখ্যা ও প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য অমন একটি স্থন্দর নৃত্যরূপ আজ লুপ্তপ্রায়। মোটামুটি বলা চলে যে দক্ষিণী নৃত্যাভিনয় দেহের উপরিভাগে, বিশেষত আঙুল, চোখ ও ভুরুতে যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি পায়ের কাজে, এবং সর্বোপরি সমগ্র দেহের ভাববিকাশের দিক থেকে তেমনই স্থূল। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের দীর্ঘকালব্যাপী পুনরাবৃত্তিতে দর্শকের দম বন্ধ হয়ে যায়, রামেশ্বরের মন্দিরে সহস্রস্তম্ভ দরদালানে সমুদ্রের হাওয়া বয়, কিন্তু তবু যেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। কলার উৎকর্ষ সংখ্যার পরাকাষ্ঠায় নয়।

উৎকৃষ্ট বলী-নৃত্য আমি দেখিনি। যা দেখেছি ও রবীন্দ্রনাথ ও স্নীতিবাবুর মারফত যা শুনেছি তাইতে মনে হয় যে সেটি দক্ষিণ-ভারতীয় পদ্ধতির প্রসার এবং উত্তরভারতীয় নৃত্যপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বলী ও দক্ষিণী নৃত্যের আঙ্গিক দৈহিক 'প্লেনে' ভাঙা এবং জোড়া, উত্তরভারতীয়ের মতন রেখার লীলা নয়। উত্তরভারতীয় কলাবিদ্ যতই আসরের ওপর ঘুরে বেড়ান না কেন, একটি মুহূর্তে তিনি তাঁর দেহের যে-কোনো একটি প্লেনেই অবস্থান ও প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর ব্যতিরেক ক্ষণস্থায়ী, তাঁর ভারসাম্য মাধ্যাকর্ষণ রেখাশ্রিত প্লেনেরই মধ্যে। 'লহরা' ও 'তোড়া'র পর যেমন লয়ে ফিরতে হয়, তেমনই ভাও-বাতান ও নৃত্যের পর উত্তরভারতীয় নর্তক এমন একটি স্থিরভঙ্গিমায় ফিরে আসেন যার ভারসাম্য স্বাভাবিক। অবশ্য মানুষে যেরকম ভাবে দাঁড়িয়ে কি বসে থাকে সেরকম স্বাভাবিক নয় বলাই বাহুল্য। মোটামুটি একই প্লেনের মধ্যে উত্তরভারতীয় কলাবিদের গতি আবদ্ধ বলে 'পায়ের কাজ' সম্ভব, কারণ এই 'পায়ের কাজ' অর্থাৎ বোলের পদানুবর্তিতা একই লম্ব-ভাবাপন্ন তলের উত্থান ও পতনেই সম্ভব। কিন্তু তাণ্ডবের কিংবা দীপলক্ষ্মীর বিভিন্ন মূর্তি যিনি দেখেছেন তিনিই বুঝবেন দক্ষিণীনৃত্যের আঙ্গিক কত পৃথক। তার মর্মকথাই হলো দেহের প্লেন ভাঙা, প্রতি পায়ের, প্রতি হাতের, প্রতি আঙুলের, স্কন্ধের এমন-কি বুকের প্লেনও ভিন্ন। একটিকে অবশ্য স্থায়ী এবং তাকে অবলম্বন করে অন্য প্লেনের সামঞ্জস্য বিধানেই যথার্থ কৃতিত্ব। সাধারণত বুকের প্লেনকেই প্রধান করা হয়। দুটি চোখ ও ভ্রূর মধ্যে একটি উঁচু অন্যটি নিচু দেখেছি। এইরকম প্লেন ভাঙার ব্যাপারে 'পায়ের কাজ' অচল। এ যেন দেহের হার্মনি, এতে মীড় ও লালিত্য কম, কিন্তু বৈচিত্র্য বেশি। দক্ষিণীনৃত্য পুরুষেরই উপযুক্ত, ব্যালে-নৃত্যে য়ুরোপীয় মেয়েদের পা তোলা, কি ছোড়া ভারতীয় ভব্যতায় যেন বাধে।

চিত্রাঙ্গদা পুরুষোচিত ভাবপ্রকাশের জন্য দক্ষিণীনৃত্যের ভঙ্গিতেই নাচেন। সমবেতনৃত্যের আঙ্গিকও দক্ষিণী হতে পারে না।

মণিপুরী-নৃত্যের সঙ্গে আমাদের প্রায় সকলেরই পরিচয় যৎ-সামান্য। রবীন্দ্রনাথ একটি মণিপুরী নর্তক পরিবারকে শান্তি-নিকেতনে আমন্ত্রণ করেন। এখনও মণিপুরী শিক্ষক সেখানে শিক্ষা দেন। কিন্তু তাঁদের শান্তিনিকেতনের ওপর প্রভাব কেবল উপস্থিতির জন্য নয়। মণিপুরী ঘরোয়ানার সমবেত-নৃত্যের সুচারু বিকাশ, ভব্যতা ও কবিত্ব রবীন্দ্রনাথকে সহজেই আকৃষ্ট করে। তার সাজ-সজ্জা, ভঙ্গি, গতি এবং নায়কনায়িকার সাথে অন্য পাত্রপাত্রীর সম্বন্ধের ভদ্র সংযমে কবি যেন প্রাণের কথার উত্তর পান। মণিপুরী নৃত্যের প্রাণবস্তু কী? নেহাত মোটামুটি বলা চলে, দক্ষিণী ও বলীনৃত্য ভাস্কর্য, লক্ষ্ণৌএর নৃত্য সংগীত এবং মণিপুরের নৃত্য কাব্যধর্মী। চিত্রাঙ্গদা নাট্যের পক্ষে মণিপুরের বিশেষ যোগ তার সমবেত নৃত্যে, যার আঙ্গিক লক্ষ্ণৌ-এ কিংবা দক্ষিণে বিশেষ কিছু নেই। অবশ্য সাঁওতালী নৃত্যের কাছে কবি ঋণী হতে পারতেন— কিন্তু সাঁওতালী দলের নাচে গতি থাকলেও স্ত্রী ও পুরুষের দল কেমন যেন একটি সূত্রেই বাঁধা, অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে সে-গতি যন্ত্রের। সেখানে পুরুষের দল হয় এগিয়ে যাচ্ছে, না হয় পিছু হটছে, স্ত্রীর দল যেন তারই উত্তর দিচ্ছে— অনেকটা শুকসারির ছড়ার মতন। আবর্তনও চক্রবৎ। য়ুক্লিডের প্রথম পুস্তকেরই মতন তার নকশা। সাঁওতালী নৃত্যকে শ্রদ্ধা করার পরও মানতে হবে যে চিত্রাঙ্গদার মতন নাট্যে তার দান খুব বেশি হতে পারত না। মণিপুরী নৃত্যে প্রত্যেকেরই গতি আছে, প্রত্যেকের গতি মিলেমিশে একটি বিচিত্র নকশা তৈরি হচ্ছে, যেটি আবার অন্য একটি ছকের সঙ্গে কখনও মিশে যাচ্ছে, কখনও বা তাই থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মণিপুরী নৃত্য যেন একটি পার্শিয়ান কার্পেট, কিংবা ক্যালীডস্কোপ। চিত্র তার রূপভঙ্গি, অথচ তার সমগ্রতার

অনুভূতি বিশেষের মুখ চেয়ে থাকে না। মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিক কবি গ্রহণ করতে তাই বাধ্য হয়েছেন।

শান্তিনিকেতন নৃত্যে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রভাব ভিন্ন অন্য বিশেষত্ব ছিল রেখার লীলায়। অবশ্য রঙের খেলাও ছিল সাজসজ্জার অপূর্ব সমাবেশে। মোটামুটি তাকে চিত্রধর্মী বলা যায়, সংগীতাংশ বাদ দিলে। আমার বক্তব্য এই মণিপুরের কাব্যনিষ্ঠ ভদ্রতার সঙ্গে রবীন্দ্র প্রবর্তিত নৃত্যের যোগ নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এতদিন যোগ ভিন্ন সমন্বয়ের, অর্থাৎ গ্রহণের পর নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন ও সুবিধা হয়নি। অন্যান্য রবীন্দ্রনাট্যের পক্ষে যোগটুকুই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা নাট্যের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। তার গল্পাংশ জটিল, তার প্রধান চরিত্রে দ্বন্দ্ব আছে, পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত জটিল, চিত্রাঙ্গদায় অভিনয়ের সুযোগ বেশি। তার নৃত্যপদ্ধতি রেখা-ভঙ্গিতেই আবদ্ধ থাকলে নাট্যের জটিলতার প্রতি অবিচার হয়। রেখা ছাড়া তার আরো অন্য কিছুর আশ্রয় চাই। দক্ষিণী অভিনয় স্থূল, কিন্তু তার 'প্লেন ভাঙা' নতুন, সেটি চতুষ্কোণের তৃতীয় বাহু কিংবা অন্য পরিমাণের ইঙ্গিতবাহী, অতএব চিত্রাঙ্গদা নাটকের গভীরতার উপযোগী। মণিপুরী নৃত্যের পাত্রপাত্রীর সমাবেশ, সমবেত-নৃত্য, তার সুন্দর নকশা এবং সর্বোপরি তার সংযম যেন চিত্রাঙ্গদার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। উত্তরভারতীয় নৃত্যের ছন্দলালিত্য আরো বেশি গ্রহণ করবার সুযোগ চিত্রাঙ্গদায় রয়েছে। ভিন্ন আঙ্গিকের প্রকৃত বন্টনও হয়েছে—পুঞ্জনৃত্যে মণিপুরী, ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে পুরুষনৃত্যে দক্ষিণী এবং মহিলানৃত্যে উত্তরভারতীয় আঙ্গিকের পরিচয় পাই। হয়তো মণিপুরীর প্রভাব সামান্য একটু বেশি হয়েছে কোথাও কোথাও। অর্জুনের নৃত্যে পৌরুষ অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাই সন্দেহ হয়েছিল, যদিও মহিলাকে দিয়ে পুরুষাভিনয়, অর্জুনের ঐপ্রকার অবস্থা, এবং অ্যাকিলিসের মতন বীরেরও

স্ত্রীসুলভ কমনীয়তার স্মৃতি সন্দেহের নিরাকরণে সদাজাগ্রতই ছিল।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের পিছনকার ভূমিকা এবং সম্মুখের ইঙ্গিত আছে। গ্রহণ কথাটি অনেকবার ব্যবহার করেছি। গ্রহণ অর্থে সমন্বয়; এবং সমন্বয়টিই আসল কথা। দর্শক প্রথমেই সমগ্রভাবে চিত্রাঙ্গদা নামক নৃত্যনাট্যকে উপভোগ করেন, উপলব্ধির সময় কিছুতেই সৌন্দর্যসৃষ্টির উপাদানের কথা তাঁর মনে পড়ে না। মনে পড়ে পরে, বিচারের সময়। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য দর্শকের পক্ষে একটি অখণ্ড সৃষ্টি। স্রষ্টার মস্তিষ্কে অবশ্য সংকলন পদ্ধতি ছিল, আঙ্গিকের ভিন্নতা স্বীকার তাঁকে করতেই হয়েছিল, নচেৎ সংকলন হবে কিসের? সেই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের সংকলন রূপ পেল এককে, যেটি দর্শকের কাছে সগৌরবে উপস্থিত হয়েছে। আমি স্রষ্টার সমস্যা ও সমাধানকেই বিচার করেছি, ঐতিহাসিকের মতন বিচার করিনি। সে যাই হোক্ চিত্রাঙ্গদাকে আমি মহৎ সৃষ্টি মনে করি। তার মহত্ত্ব যদি প্রকাশ না হয়ে থাকে সে আমার ভাষার দোষ। কিন্তু স্রষ্টার দিক থেকে যদি অন্য কেউ আরো স্পষ্টভাবে সৃষ্টির বিচার করেন তবে তার মহত্ত্ব উপলব্ধিতে সকলেই আমার মতন স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেনই হবেন।

এইখানে বোধহয় নৃত্য সম্বন্ধে যা বলেছি তার পুনরাবৃত্তি দরকার, যদিও নৃত্য সেই অখণ্ড সৃষ্টির অঙ্গ। নৃত্যকলা সম্বন্ধে দেশে বেশি আলোচনা হয়নি, এবং দেশে নৃত্য সম্বন্ধে সাড়া পড়েছে—এইটুকুর জন্যই নৃত্যের ওপর এতটা জোর দিচ্ছি। বিশুদ্ধ নৃত্যের দিক থেকে বলা যায় যে চিত্রাঙ্গদায় নৃত্যকলা মুক্তিলাভ করেছে। যোগশাস্ত্রে বলে কানই নাকি ব্রহ্মচারীর পরম শত্রু। অন্তত দর্শকের পক্ষে বিশুদ্ধ নৃত্যরসের উপভোগে তো বটেই। সংগীত ভিন্ন নৃত্যের অস্তিত্বে আমরা অভ্যস্ত নই। এক্ষেত্রে অভ্যাসটি আরো দৃঢ়,

কারণ যিনি নৃত্যরূপ পরিকল্পনা করেছেন তিনি নিজে একজন সংগীত রচয়িতা, বহুদিনের এবং উচ্চদরের। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের ও আমাদের অভ্যাস ভাঙার কল্পনাতীত দুঃসাহসী কাজে ব্রতী হয়েছেন। চিত্রাঙ্গদায় মধ্যে মধ্যে সংগীত স্তব্ধ হয়, মাত্র তালই চলে পাখোয়াজের সঙ্গে, তালের ঠোকা ও আড়ি। নৃত্য তখন পুরুষের। সংগীতের ইচ্ছাকৃত বিরতি নিশ্চয়ই অনেকে লক্ষ্য করেছেন। কেন সংগীত স্তব্ধ হয় আমাদের বিচার্য।

ধরা যাক্, নৃত্য কথা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে, কিন্তু পূর্ণস্বরাজ পাবার পথে তখনও বিপত্তি থাকে। কথা-বিহীন সুর-লীলার মোহকেও তার কাটাতে হবে। কাজটি ভীষণ শক্ত। নানাপ্রকার মধুর মায়া এই দ্বিতীয় স্তরে আমাদের আচ্ছন্ন করে, অন্তত করতে পারে। হুবহু দৃষ্টান্ত দিতে পারব না, কিন্তু দৃষ্টান্ত কল্পনাতীত নয়। রাগিণীর যেমন মেজাজ, স্বর, স্বর-যোজনা, বাদী-বিবাদী, তান-কর্তব, প্রসার থাকে, তেমনি প্রত্যেকটির অনুযায়ী দৈহিক ভঙ্গিমা ও সঞ্চালন খুবই সম্ভব। গৌড়-সারং-এর 'রে গা রে মা গা' যেমন, তেমনি উপযুক্ত মনোভাবের নৃত্যব্যঞ্জনার অনুযায়ী একটি বিশেষ সঞ্চালন কেন হবে না? অতি অল্পস্থলে সত্যকারের আর্টিস্টের ভঙ্গিমায় আমি রাগিণী-রূপের নৃত্যরূপ দেখেছি মনে হয়, যেন পিলুর খোঁচ সে ভঙ্গি ছাড়া প্রকাশ পেত না। বলা বাহুল্য, এই স্তর পূর্ববর্ণিত স্তরের উচ্চে; এবং উদয়শংকর ও তিমিরবরণের সহযোগিতায় যে রূপ উদ্ভাবিত হয়েছে সে ভিন্ন অন্যত্র এখনও এই স্তরে আরোহণের নিদর্শন দেশে পাইনি। তবুও আমি শেষস্তরের আলোচনা করছি যেখানে নৃত্য ও সংগীতের সমধর্মিতাও লোপ পাবে। এখানে বাধা তোলে আমাদের হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি। রাগের যে সংজ্ঞা আছে তাই থেকে, এবং ভালো ওস্তাদের মুখে রাগিণীর রূপ বিকাশের ধারা লক্ষ্য করে বলা চলে যে আমাদের গায়ন পদ্ধতিতে

আরোহী-অবরোহী ভিন্ন অন্য 'ভুজ' নেই। যন্ত্রসংগীতে তরফের তারের জন্য, একই সঙ্গে একাধিক আঙুল দিয়ে একাধিক তারের আঘাত, অর্থাৎ চিকারা এবং 'জোড়ের' বাজনায় অন্য ভুজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গায়ন পদ্ধতিতেই তানপুরার সাহায্যে অন্য ভুজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুরের জুড়ী, নিম্ন পঞ্চম ও ষড়জ যদি ভালো করে বাঁধা যায় তবে পর্দার সব সুরই আসে একই সঙ্গে। তদ্‌ভিন্ন স্বরের গতির জন্য গাম্ভীর্য ও ভলুম হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। তার ওপর মূলকাণ্ডের আশ্রিত শাখাপ্রশাখার মতন তানকর্তবও রয়েছে। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে কোনো তৃতীয় প্লেনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না যার ইঙ্গিত আছে শিল্পশাস্ত্রের ভাষায় 'সন্নাহ' কথাটিতে। যদিও থাকে তবু নৃত্যে, বিশেষত পুঞ্জনৃত্যে আলাপ অচল, সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য অসম্ভব। সেইজন্য নৃত্যে দুএর অধিক প্লেনভাঙার প্রয়োজন যদি ওঠে তবে প্রযোজকের বিপদ। তাঁর চারটি উপায় আছে এক্ষেত্রে— তানপুরা, অন্যান্য যন্ত্র এবং পাখোয়াজ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ, কণ্ঠের সাহায্যে নতুন ধরনের তান তোলা, বিদেশী হার্মনির প্রবর্তন, কিংবা সংগীতকে স্তব্ধ করা, মাত্র তাল দেওয়া। প্রথম দুটির অর্থই হলো সংগীতের অধীনতা স্বীকার করা; তাদের সাহায্যে নৃত্য স্বাধীন হয় না। তাদের মধ্যে অবশ্য প্রথমটিকে রবীন্দ্রনাথ অবলম্বন করলে খুব ভালো হতো— উদয়শংকরের দলে তানপুরা, সারেঙ্গী, তবলা, পাখোয়াজ, এমন-কি কাঁসরঘণ্টাও ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে তান চলে না এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা তান সাধেন না। বিদেশী হার্মনি জোর জবরদস্তি করে আনার সাহস রবীন্দ্রনাথের নেই, তিনি নিজেই লিখেছেন যে তিনি ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হতে চান না এবং পারেন না। (আজকালকার কনসার্ট এবং তথাকথিত আবেষ্টন সংগীতে এই প্রচেষ্টা চলছে।) অতএব, পূর্ববর্ণিত সব কথাগুলি মনে রাখলে

আমরা বুঝব কেন সংগীত মধ্যে মধ্যে চিত্রাঙ্গদায় নীরব হতে বাধ্য। নীরব কিন্তু প্রাণস্পন্দন চলছে। স্পন্দনের ছন্দের মতন তখন আঘাত চলেছে, কিন্তু সে-আঘাতে বাটোয়ারা নেই। জাগরণ ও নিদ্রার সন্ধিক্ষণে আসে সুষুপ্তি— যেখানে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ নয়, সরল ও স্বাভাবিক। তাই বলে চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যনাট্য আজ নৃত্যকে উর্ধ্ব-স্তরে তুলে ধরলে যেখানে গিয়ে তার আত্মপরিচয় হলো। নাট্যের জটিলতা আজ সরল ছন্দে পরিণত; শুদ্ধতা অর্জনের ফলে নৃত্য আজ আত্মবিশ্বাসী।

এতক্ষণ আমি নৃত্যের স্বরাজ সাধনের বিবরণ দিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বরাজলাভের পর যে আন্তর্জাতিক মিলন ঘটে সেই প্রকৃত মিলন। তখনই হয় দেশে দেশে প্রকৃত বন্ধুত্ব, কারণ, কেউ কারুর অধীন নয়। শুদ্ধ নৃত্যকলার উদ্‌ভাবন অর্থে সংগীতকে পদানত করা নয়। সব জ্ঞানে, সব কলাবিদ্যার উৎকর্ষের ইতিহাসে দুটি গতি আছে; ত্যাগের দ্বারা শুদ্ধি, এবং শুদ্ধির পর, সমানে সমানে, পূর্ব-পরিত্যক্তের সাথে পুনরায় মিত্রের সম্বন্ধস্থাপন। রবীন্দ্রনাথ, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে, নৃত্যের শুদ্ধতায় আরোহণ করে সম্বন্ধে অবরোহণ করেছেন তাই চারুকলার সমন্বয় চিত্রাঙ্গদায় সর্বাঙ্গীন হয়েছে। কোনো কলার প্রতি অশ্রদ্ধা সূচিত হয়নি। চিত্রকলার ব্যবহার কত সুচারু হয়েছে আমি বোঝাতে পারব না। পূর্বেই শান্তিনিকেতনী নৃত্যে রেখার লীলা উল্লেখ করেছি। তার ওপর সাজসজ্জার বর্ণ সমাবেশ এবং রঙ্গমঞ্চের ও দৃশ্যপটের সুব্যবস্থা অত্যন্ত সুচারু হয়েছিল। একাধিক অভিজ্ঞব্যক্তি চিত্রাঙ্গদা অভিনয়কে একটি চলন্ত ছবির সঙ্গে তুলনা করেছেন। শুনেছি, এই সুব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ, শ্রীপ্রতিমাদেবী ও সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের কাছে ঋণী।

রঙ্গমঞ্চের ওপর সুব্যবস্থাতেও পূর্বোক্ত সশ্রদ্ধ ব্যবহারের নিদর্শন মেলে। সংগীতমুখর নৃত্যনাট্যের প্রযোজনা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার।

যেখানে নাট্য সংগীতাধীন সেখানে নাটকীয় গতি রুদ্ধ হয়। আবেগ যায় থেমে যখন শ্রোতৃমণ্ডল নৃত্যরত নায়ক-নায়িকার মুখে গল্প শোনে। পুরাতন কালে যাত্রায় তাই হতো। অতএব, নাটকীয় যুক্তি অনুসারে শ্রমবিভাগের প্রয়োজন উঠেছিল। ক্রুতিরক্ষার জন্য পাত্র-পাত্রী ভিন্ন অন্য একদল গায়ক-গায়িকাকে রঙ্গমঞ্চে অবতারণা করা হলো। কিন্তু আমাদের বাল্যকালের দেখা যাত্রায় তার ফল হতো বিপরীত। কথাকলি, বলী ও উদয়শংকরের নৃত্যে ফল শুভ হয়েছে। মায়ার খেলা, বাল্মীকিপ্রতিভা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাট্যে এই রীতি অবলম্বিত হয়নি শুনেছি। ইদানীং রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আঙ্গিকটিকে সশ্রদ্ধভাবে ব্যবহার করেছেন। চিত্রাঙ্গদায় তার প্রকৃত বিকাশ। পাত্র-পাত্রী ভিন্ন একটি গায়ক-গায়িকার দলকে রঙ্গমঞ্চের পিছনে, কিংবা কোণে বসালে এবং তাদের সংগীতকে প্রাধান্য না দিলে নাটকীয় গতিরক্ষার সুবিধা হয়। এঁরা যাত্রার জুড়ি নন, কোরাসও নন। তাঁরা কেবল পটভূমি, তাঁদের সংগীত কেবল ভূমিকা ও বিচ্ছিন্ন ব্যবহারের সূত্র মাত্র। কবি নিজে রঙ্গমঞ্চের অবস্থান-ত্রিকোণের শীর্ষে বসেন। তাঁর উপস্থিতি ও আবৃত্তি পূর্বোক্ত রীতির চূড়ান্ত নির্দেশ।

অবশ্য ভূমিকা থাকলেই যথেষ্ট হলো না। সূত্র যদি ঘটনাকে না গ্রথিত করে তবে সেটি অনাবশ্যক। কথাকলি প্রভৃতি অভিনয়-মূলক নৃত্যে ভূমিকাটি স্থির, গল্পাংশ তাই প্রধান চরিত্রের অভিনয় এবং সাজসজ্জার সাহায্যে প্রকট হয়। মাত্র একটি অর্ধউচ্চারিত একটানা সুর থাকে, তার উত্থান-পতন ও অন্য বিবর্তন যৎসামান্য, এবং আত্মপ্রচারে যত্নবান নয়। কথাকলি প্রভৃতিতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের পরিচিত ঘটনা অভিনীত হয় বলে শ্রোতাদের গল্পাংশ খোলাখুলি বুঝিয়ে দেবার আবশ্যক থাকে না। এই অবসরে অভিনেতা নিজের আঙ্গিক দেখাবার দীর্ঘ অবসর পান। সাজসজ্জাও

এমন ধরনের যাতে চরিত্রের ও তার মূলভাবের প্রকৃতি অতিরঞ্জিত-ভাবে দর্শকের সামনে সদাবিরাজমান। ভাবগুলির টাইপও মুখোশে মূর্তিমান। (ইংরেজি পার্সনালিটি কথাটির আদিতে রয়েছে পার্সনা= মুখোশ) যেখানে পূর্বপরিচয় রয়েছে সেখানে ঘটকালি উপরন্তু, বাহুল্যের চিহ্ন। অভিনেতা ও দর্শকের মন পূর্ব হতেই কথাকলি ও বলী-নৃত্যে (অন্যান্য সব দেশী নৃত্যাভিনয়েই) সংযুক্ত। তখন ঐ সাংগীতিক ভূমিকা, (দক্ষিণী ওস্তাদের ভাষায়) শ্রুতির কাজ করে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার গল্প দর্শকের মোটেই সুপরিচিত নয়। অতএব গল্পের বিবরণ দেওয়া এবং নাটকীয় গতি রক্ষা করা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রধান কর্তব্যের শামিল। এই কর্তব্য-পালনের জন্যই চিত্রাঙ্গদার সংগীতকে কথাকলি অপেক্ষা বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে।

উদয়শংকরের নৃত্যাভিনয়ে ভূমিকাটি প্রযুক্ত হয়েছে। তাঁর রঙ্গমঞ্চের পিছনে গায়ক-বাদকের দল বসে ভূমিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু সূত্র হিসাবে সাংগীতিক ভূমিকার স্থান কতটুকু আমাদের বিচার্য। সংগীতের ব্যবহার তাঁর কিরূপ? সে ব্যবহারে নৃত্যের স্বরাজ-সাধনার পর অন্য চারুকলার প্রতি যে শ্রদ্ধার উল্লেখ করেছি তার কতটুকু বর্তমান? চিত্রকলার ব্যবহার, আমার মতে, উদয়শংকরের নৃত্যে চমৎকার, অর্থাৎ সশ্রদ্ধ। উদয়শংকর নিজে একজন চিত্রশিল্পী। কিন্তু তিনি বোধহয় সেই শ্রেণীর সুরজ্ঞ কিংবা সুররচয়িতা নন। তিমিরবরণ ভট্টাচার্যই (ইদানীং শেরালী. মহাশয়) উদয়শংকরের নৃত্যোপযোগী সুর জোগান দেন। দুজনেই উচ্চশ্রেণীর আর্টিস্ট। উদয়শংকরের নৃত্যে আছে মোহন অভিব্যক্তি, এবং তিমিরবরণ ও তাঁর দলের শিল্পীরা যে সেই বিবর্তনশীল নৃত্যের উপযোগী সাংগীতিক বিকাশ দেখাবেন সে আর বিচিত্র কি? তথাপি, দুটি গতির সর্বত্র মিল নেই, কোথাও কোথাও নৃত্যের নাটকীয় পরিবর্তনের অনুরূপ

সাংগীতিক নাটকীয় পরিবর্তন যেন পাওয়া যায় না। দুটি প্রকাশভঙ্গি যেন সমান্তরাল রেখায় চলে, সংগীত-নৃত্যের অপরূপ সৃষ্টি হয় না, হয় দুটি রসের, সংগীতের এবং নৃত্যের। নৃত্যের রূপ যখন ফুটছে, তখন নাটকীয় গতি নৃত্যের সাহায্যে সবল হলো, যখন নৃত্য শিথিল, তখন নাটকীয় গতি সাংগীতিক সাযুজ্যের অভাবে ঢিমে হয়ে পড়ল। সাধারণত উদয়শংকরের ব্যক্তিগত কৃতিত্বে, তাঁর প্রতিষ্ঠার আশীর্বাদে, তাঁর প্রযোজনা শিল্পের জন্য এই দুর্বলতাটুকু ধরা পড়ে না— কিন্তু দুর্বলতাটুকু যেন তাঁর পদ্ধতির অন্তর্নিহিত মনে হয়। যেখানে সংগীত উৎকর্ষ লাভ করেছে, সেখানেও যেন অত্যন্ত সন্ত্রস্তচিত্তে উদয়শংকরের পদানুসরণ করাই সংগীতের উদ্দেশ্য আমার সন্দেহ হয়েছে। অনুসরণও একপ্রকার অনুকরণ, অবশ্য নিজের ভাষায়, তাই সমান্তরাল রেখার উপমা দিয়েছি। উদয়শংকরের পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধরা যাক্, উদয়শংকর শিবের নৃত্যাভিনয় কল্পনা করছেন; শিবের সঙ্গে ভৈঁরোর একটি সংস্কারগত যোগ আছে; পিছন থেকে ভৈঁরোর সুর উঠল, কণ্ঠে কিংবা বাদ্যে; উদয়শংকর নীরবে, অথচ অপরূপ অব্যক্ত অনুচ্চারিত ভাষায় ও ভঙ্গিতে নৃত্য শুরু করলেন, তার নানা রূপ ব্যক্ত হলো; পিছনের কনসার্টে কিংবা কণ্ঠে ভৈঁরোর ধুন্-চৌধুন, তান-কর্তব চলল। দুটিই আমাদের ভালো লাগছে। কিন্তু হঠাৎ যেন কোথায় ছেদ পড়ল মনঃসংযোগে, কান ও চোখ পৃথক হলো, সেই ফাঁকে দীর্ঘ হয়ে ঝুলে পড়ল অভিনয়ের সূত্রটি। শিবপার্বতীর দ্বন্দ্বে দোষটি বর্তমান ছিল, এবং সেই নৃত্যটিই বোধহয় উদয়শংকরের কল্পিত নৃত্যনাট্যের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিত।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে সংগীত ও নৃত্যের সম্বন্ধ পূর্বপ্রকারের নয়, মিশ্রণের। সে-মিশ্রণের অনুপাত যথার্থ, কারণ, সেখানে নৃত্য স্বাধীন, সংগীতের ব্যবহারও তাই সশ্রদ্ধ। সেইজন্য সমগ্রতা-সৃষ্টির দিক থেকে চিত্রাঙ্গদা শিবপার্বতীর দ্বন্দ্ব অপেক্ষা বেশি সার্থক হয়েছে

মনে হয়। এমন মূর্খ কেউ নেই যে উদয়শংকর কিংবা তিমিরবর্ণের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের যে-কোনো ছাত্র-ছাত্রীর তুলনা সম্ভব মনে করে। তুলনা চলে উদয়শংকরের ধারণার সাথে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী, তাই তাঁর সৃষ্টিকে স্থাপত্য বলতে ইচ্ছা হয়— যেখানে মন্দিরের সঙ্গে পরিবেশের মিলন অঙ্গাঙ্গী, যার মধ্যকার ভাস্কর্য স্থাপত্যের অন্তরঙ্গ, যার দেওয়ালের চিত্র ভাস্কর্যের অনুরূপ, যার পূজারি, উপাসক-সম্প্রদায়ের গঠন, আচার-ব্যবহার, গতিভঙ্গিটিও অত্যন্ত সুসদৃশ, যার নৃত্যগীত যেন সেই মন্দিরের পাথর গলা স্রোত, যার নৃত্য নিষ্ঠাচারের অঙ্গ। কল্পনা-কৈবল্যের জন্যই চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

সমগ্রতার দিক থেকে চিত্রাঙ্গদার আলোচনা করলাম। স্থলবিশেষে ত্রুটি আছে, লক্ষ্যও করেছি, নির্দেশও করেছি। কিন্তু মূল সম্বন্ধে ত্রুটি নেই, সূত্র বিচ্ছিন্ন নয়। বিশেষের আলোচনা আমার সাধ্যাতীত বিশ্লেষণের ফলে যদি সমন্বয় উপলব্ধিতে বাধা ওঠে তবে সেটি— সেইটুকু বোধ হয় আমার সৃষ্টি।

চিত্রাঙ্গদা দেখে ট্রেনে ফেরবার পথে মনে উঠেছিল নৃত্যের, নৃত্যনাট্যের ভবিষ্যতের কথা। এত দ্রুতভাবে, নবজীবনের সঞ্চার হতে না হতেই এমন একটি কীর্তি বাংলাদেশে যে সম্ভব হলো তার জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। চিত্রাঙ্গদার মতন অমন একটি সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয়, কিন্তু সময় লাগবে। তাই মনে হলো, অতঃপর যে সব আর্টিস্ট জন্মগ্রহণ করবেন তাঁরা একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার অনুকরণ করবেন এবং তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হবেন। কিন্তু নান্যেব পন্থাঃ। অমন প্রতিভার প্রতি ক্রোধ, দ্বেষ, অকৃতজ্ঞতা আমাদের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। স্বভাবে যেটি ফুটতে লাগে দীর্ঘকাল, তাকে অসামান্য প্রতিভার জোরে ফুটিয়ে তোলা—

এ অন্যায় মানবপ্রকৃতি সহ্য করে না। অগণিত যুবকেরা সৃষ্টিকার্যে বঞ্চিত হলো— রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত তাঁর পদ্ধতি বিচার করে, বিচারের পর স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করে। একি হবে? আমার প্রবন্ধ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো যুবকদের জানিয়ে দেওয়া যে চিত্রাঙ্গদায় একটা কিছু হয়েছে— ঐ শ্রেণীর অন্য কিছু না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন।

———